

রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

ভাদ্রিক সর্বাধিন

যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা

প্রগতি প্রকাশন • মাদ্রাসা



রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

ভাদিম সবাকিন

যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সমীক্ষা



প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

Библиотека политических знаний

В. Собакин
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ О ПРОБЛЕМАХ
ВОЙНЫ И МИРА

На языке бенгали

Library of Political Knowledge

V. Sobakin
MARXISM-LENINISM ON WAR AND PEACE

In Bengali

© Edições Progresso, 1982

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

C $\frac{0302030105-567}{014(01)-86}$ 287—86

সূচী

এক। যুদ্ধের হেতু: যথার্থ ও আপত্তি	৫
দুই। যুদ্ধলিপ্তির সংগ্রামে প্রথম বিজয়.	২৪
তিন। জাতিসংঘের সনদভুক্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহ	৫৯
চার। দাঁতাতের সপক্ষে, 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' বিরুদ্ধে	৭৩
পাঁচ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — বিষয়গত প্রয়োজন	৮৮
ছয়। নিরস্ত্রীকরণ — সমাজতন্ত্রের আদর্শ	১১৩



যুদ্ধ ও শান্তির মৌলিক প্রশ্নেই
গণতন্ত্রের সুস্পষ্টতম অভিব্যক্তি
পরিলক্ষিত।

ড. ই. লেনিন

এক। যুদ্ধের হেতু: যথার্থ ও আপাত

রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর থেকেই রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের
ইতিহাস সশস্ত্র সংঘর্ষ ও যুদ্ধে আকীর্ণ হয়ে আছে। চল্লিশের
দশকে লেখা একটি বইয়ে জনৈক মার্কিন পণ্ডিতের উল্লিখিত
হিসাবটি প্রসঙ্গত লক্ষণীয়: বিগত ৩৩৫৭ বছরের ইতিহাসে
যুদ্ধবর্ষ ও শান্তিবর্ষের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৩০ ও ২৫৭।*
ইতিহাসের সমবাদার ও সমাজবিকাশের ধারাপাঠে ইচ্ছুক
অনেকেই এমন এক সান্ত্বনাতীত সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে সামাজিক
ঘটনা হিসাবে যুদ্ধ অপরিহার্য এবং তা দেশ ও জাতিগুণের
সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক দিকমাত্র।

তদুপরি, অতীত ও বর্তমানের কোন কোন দার্শনিক,
তাত্ত্বিক ও রাজনীতিকের বন্ধমূল ধারণা: যাবতীয় নিষ্ঠুরতা
ও বিধবংসী শক্তি সহ যুদ্ধ আসলে একটি মঙ্গল, অমঙ্গল
নয়। শোষণমূলক রাষ্ট্রের, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে
রাজনীতিকদের জন্য এই ধরনের তত্ত্বগুলি অতীতের মতো
এখনো নিজেদের সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপের এবং দখলদারী

* দ্রষ্টব্য Bernard, L. L. War and its Causes. — N.Y.,
Henry Holt and Company, 1944.

আক্রমণাত্মক যুদ্ধগর্দুলিকে মানবজাতির বিকাশের মূল চার্লিকাশক্তি হিসাবে দেখানোর একটি ভাবাদর্শীয় সঙ্গতি মাত্র।

হিটলারের ফ্যাশিবাদের মনুষ্যদ্বেষী ভাবাদর্শ ও কর্মনীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল। এই মতবাদ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও ফলপ্রসূতা ঘোষণা সহ বিভিন্ন জাতিকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই বর্বর লক্ষ্যসিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছিল। কেবল স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের দৃষ্টান্তহীন বীরত্ব ও কৃতিত্ব, প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের এসব অবদান ও অপরিমেয় ত্যাগ তখন মানবজাতিকে দাসত্ব থেকে ও বহু জাতিকে নিশ্চিত বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছিল।

এমনটি মনে হতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর শিক্ষা বৃদ্ধি-বা মানবজাতির সমস্যা সমাধানে যুদ্ধকে একটি উপায় হিসাবে দেখার উদ্যোগের চিরলুপ্তি ঘটিয়েছে। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের আরো উন্নতি ও প্রস্তুতির পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলাফল, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কল্পনাতীত রকমের ভয়ঙ্কর হতে পারে। কিন্তু আজও কোন কোন দেশের ক্ষমতাসীন কিছু ব্যক্তি পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের কর্মনীতি পরিচালনা করছেন, যেন এতে ভয়ের কোনই হেতু নিহিত নেই।

প্রথম পারমাণবিক আঘাতের মাধ্যমে 'সীমিত' পারমাণবিক যুদ্ধে জয়লাভের মার্কিন-ন্যাটো রণনীতির অন্তর্লীন তত্ত্বটিও পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি ভিত্তিক।

প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত তথ্যটি উল্লেখ্য। ১৯৮১ সালের ৯ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৬ অধিবেশনে পারমাণবিক ধ্বংসরোধ বিষয়ক একটি ঘোষণা ভোটে দেয়া হয়। এতে পারমাণবিক অস্ত্রপ্রয়োগ ও পারমাণবিক যুদ্ধ বেআইনী হত। ঘোষণায় আরও বলা হয়েছিল যে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতারা এজন্য মানবজাতির বিরুদ্ধে কৃত ঘৃণ্যতম অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রপ্রয়োগাভিত্তিক তত্ত্বকে মানদ্বয়ের নৈতিকতাবিরোধী হিসাবেও এতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঘোষণাটি জাতিসংঘে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠতম সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগীরা এতে সম্মতি দেয় নি।

যুদ্ধের উৎস ও হেতু সম্পর্কে প্রাক-মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী তত্ত্বপ্রণেতাদের মধ্যে খুব কমই মানবসমাজের কর্মনিদ্বন্ধে যুদ্ধের ফলপ্রসূতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা খোলাখুলিভাবে বলার দৃঃসাহস দেখিয়েছেন এবং এখন দেখাচ্ছেন। বিপুল সংখ্যাগুরু জনসাধারণের কাছে যুদ্ধ যে মোটেই আকর্ষণীয় নয় এই সত্যটি শোষকশ্রেণীর স্বার্থপরিবেশক অধিকাংশ লেখকই জানতেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধ যে বিরোধ ও ভয়ের উৎস তাও তাঁদের অজানা ছিল না। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, যুদ্ধে নিহতদের অধিকাংশই তো সৈন্য, অর্থাৎ উর্দি-পর্যায় শ্রমিক ও কৃষক, যাদের পরিবারগুলি রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভূমিতে মারা পড়ে বোমার ঘায়ে, অনাহার ও যুদ্ধকালীন মহামারীতে। আর শোষকশ্রেণীর স্বার্থবাহক দার্শনিক ও তাত্ত্বিকরা জনসাধারণকে বোঝাতে চান যে যুদ্ধের অনিবার্যতা বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের গতান্তর নেই। কিন্তু

আজ যুদ্ধের পরিসর ও প্রকৃতিতে বস্তুত পুরো জাতির জড়িয়ে পড়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এজন্য জনমনে প্রয়োজনীয় দীক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্যতীত শাসকশ্রেণী নাচার। এই দৃষ্টি বিষয়ের জন্য এসব তত্ত্ব বিশদীকরণ প্রয়োজন যে যুদ্ধ একটি অমঙ্গল হলেও আসলে অপরিহার্য ও অনিবার্য। এগুটির মধ্যকার কিছু অত্যাধুনিক তাত্ত্বিকের মতে খোদ জনগণ বা মানুষ জন্মগতভাবেই হয়তো বা এই পাপের উদ্ভব ও অব্যাহত অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

এগুটির মধ্যে আছে প্রথমত ও প্রধানত যুদ্ধের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথাকথিত ‘মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব’। তত্ত্বটির আশ্রয়বাক্য: হিংস্রতা ও নরহত্যার আকাঙ্ক্ষা মানবমনস্তত্ত্বের মজাগত ও অনিবার্য ধর্ম। এই ধারণা বিশেষত পশ্চিম জার্মান দার্শনিক কার্ল জেস্পার্সের রচনায় খুবই সহজদৃষ্ট। তাঁর মতে, ‘যুদ্ধের উৎসমূল মানবাস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত এবং মানবপ্রকৃতির প্রলক্ষণের ভিত্তিতে, বা মানুষ ও মানুষের দলগুটির মধ্যকার বিষয়গত অলঙ্ঘ্য সংঘাতসমূহ থেকে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা যায় না’।*

এই মতানুসারে যুদ্ধের হেতুগুটি মানুষের অযৌক্তিক, অবচেতন প্রবৃত্তির ভূবনে মূলীভূত এবং সেগুটি হল বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাতীত, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পক্ষে দূর্গম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ধারণ ও তা দূরীকরণের যাবতীয় চেষ্টার ব্যর্থতা অবধারিত। তাই বলা হয় যে যুদ্ধবাজ হিসাবে নির্দিষ্ট

* Jaspers Karl, *Rechenschaft und Ausblick*. — München, R. Piper & Co. Verlag, 1951, S. 300.

সামাজিক ব্যবস্থা বা নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর উপর দোষারোপ নিরর্থক। কেননা, যুদ্ধ বাধে জাতিগুলির, মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের দরুন, রণমত্ত মানুষের খোদ স্বভাবের দরুন।

যুদ্ধের ‘মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটি’ ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের খুবই ঘনিষ্ঠ। এই শেষোক্ত তত্ত্বটিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের, যোগ্যতম গণ আর প্রজাতিসমূহের উদ্বর্তনের নিয়মাবলী মানবসমাজের পরিমন্ডলে যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্ত। ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের মোন্দা কথা: জাতি ও রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী বা দুর্বল, আজকের জটিল বিশ্বে টিকে থাকার পক্ষে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, আর একটি রাষ্ট্র বা জাতি এর কোনটিতে থাকবে যুদ্ধই হল তার একমাত্র পরীক্ষা।

ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের প্রত্যক্ষ বর্ণবাদী কোঁকটি সহজলক্ষ্য। এই তত্ত্বের শিক্ষায় বিভিন্ন জাতির স্বাভাবিক অসাম্য, কোন জাতির উপর অন্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, ‘শ্রেষ্ঠ’ জাতিগুলি (প্রায়শই একটি ‘শ্রেষ্ঠ’ জাতি) কর্তৃক ‘নিকৃষ্ট’ জাতিগুলিকে উৎখাত কিংবা অন্তত অধীনস্থ করার অধিকার, এমনকি কতব্যও স্বীকৃত। বলাই বাহুল্য, বর্ণবাদীদের কাছে মানবজাতিকে ‘শুদ্ধ করার’, ‘অধঃপতিত’ জাতিগুলির আবর্জনা থেকে তাকে মুক্ত করার একমাত্র পথ হল যুদ্ধ। যুদ্ধের সত্যিকার কারণগুলি থেকে ব্যাপক জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র অপসারণে ‘মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব’ বা ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের তুলনায় বর্ণবাদী তত্ত্ব অনেক বেশি কার্যকর। কোন কোন নরগোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠীকে তাদের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য জাতিকে উৎখাত

ও অধীনস্থ করা যে তাদের কর্তব্য ও পেশা তা বোঝানোই এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের উৎস সম্পর্কে উপরোক্তগুলির মতোই প্রকৃতিগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল আরেকটি তত্ত্ব হল ম্যালথুসীয় তত্ত্ব। আঠার শতকী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ম্যালথুসের নামাঙ্কিত এই মতবাদের মর্মবস্তু: গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়-উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার বহুগুণ বৃদ্ধিই আসলে মানুষের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। খোদ ম্যালথুস এবং বিশেষত তাঁর ইদানীংকার অনুসারীদের একটি প্রান্ত সিদ্ধান্ত হল: জনাধিক্য এবং স্থায়ী বাড়তি জনসংখ্যা অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁদের মতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং অবশ্যই যুদ্ধ মাঝেমাঝে ‘বাড়তি’ জনসংখ্যা উৎখাতের পক্ষে ‘রক্ষকপাট’ হিসাবে একাধারে স্বাভাবিক ও আবশ্যকীয়। জনাধিক্যের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিই দায়ী, যেখানে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ‘সুসভ্য’ দেশগুলির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার অনেক বেশি — আধুনিক ম্যালথুসপন্থীরা এই অভিযোগের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের আধুনিক বক্তব্যের অনুসৃত উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। উল্লেখ্য সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য ‘সুসভ্য’ দেশগুলির ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ও নির্যাতনের ফলাফলগুলিকে দায়ী না করে তা ওইসব দেশের খোদ জনগণের ‘অর্থনৈতিক’ স্বভাব ও তাদের ‘অতিপ্রজননকেই’ দোষী সাব্যস্ত করে। যুদ্ধকে অনিবার্য নিয়তি হিসাবে এবং যুদ্ধরোধকে দুরাশা হিসাবে দেখানোও এই বক্তব্যের অন্যতম লক্ষ্য।

যুদ্ধের উৎস সম্পর্কিত ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বটিও বর্ণবাদ ও

ম্যালথুসবাদের খুবই ঘনিষ্ঠ। তত্ত্বটি যে-মূলসূত্রে আশ্রিত তা হল: রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষত জনবহুল রাষ্ট্রসমূহ বস্তুত প্রাণীদের মতোই, হয় বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, অথবা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরই অনূদিসন্ধান্ত: রাষ্ট্রের সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষ দিকগুলি বা নীতির দরুন পরদেশগ্রাসের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না, এটি ঘটে তার ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ও দেশের আয়তনের অনুপাতের জন্যই। ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ আসলে বাড়তি জনসংখ্যার জীবননাশের একটি প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ।

বিশ শতকে যুদ্ধের উৎস সম্পর্কে আরেকটি নতুন তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। তদনুযায়ী যুদ্ধ হল সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতিগুলির অস্তিত্বের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সার্বভৌমত্ব, এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, এবং কোন চূড়ান্ত পরারাজ্জিক শক্তির অনুপস্থিতির দরুন বিশ্বে অনিবার্য নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকবে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বার্থসংঘাত, দ্বন্দ্ব দেখা দেবে — যার মীমাংসা কেবল যুদ্ধের দৌলতেই সম্ভব।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষের বিবিধ 'সত্যিকার হেতু' অবশ্যই অসংখ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্রনেতাদের সংকীর্ণতা, অযোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির অভাবকেই দায়ী করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে রাষ্ট্রচালকের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা বিভিন্ন দেশের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার অভাব, রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থের সৃষ্টির মূল্যায়ন এবং সৈন্যবাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনলোপের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত চুক্তিতে

পেঁছনোর ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা বা অনিচ্ছাই যুদ্ধের হেতু।

এইসব মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে যুদ্ধ খুবই সহজপরিহার্য। অর্থাৎ এজন্য সচেতন, সং, প্রাজ্ঞ ও সদিচ্ছাশীল নেতাদের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার দেয়াই যথেষ্ট, যাঁরা সর্বদা জটিলতম সমস্যাগুলির একটি সম্মানজনক সমাধান খুঁজে পাবেন এবং এভাবে অটুট শান্তি ও অন্যান্য দেশের সমগণা নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ইতিহাসে অতীতের মতো আজও এই প্রত্যয়টি বহুলব্যবহৃত যে, ওই সম্পর্কগুলির সাংগঠনিক কাঠামোর বিদ্যমান অপূর্ণতার দরুনই প্রধানত যুদ্ধগুলি ঘটে। ফলত চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা হয়েছে অটেল গবেষণাগ্রন্থ এবং সেগুলির লেখকরা বিশদ করেছেন যুদ্ধরোধের দুর্লভ্য প্রাচীর নির্মাণের উদ্দেশ্যে সব ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল, বিশ্বকংগ্রেস, ইত্যাদির নীলনকশা।

এমন কি আজও অনেকে নিশ্চিত যে, একটি আন্তর্জাতিক সংঘের কাছে রাষ্ট্রগুলি আপসে তাদের বিবাদ-বিসংবাদগুলি হাজির করলে এবং সাধারণ সংখ্যাধিক ভোটে গৃহীত সেই সংঘের সিদ্ধান্ত পালন তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হলেই যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

সন্দেহ নেই, সশস্ত্র সংঘর্ষ রোধের সাফল্য বা ব্যর্থতায় রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিত্ব ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সাংগঠনিক ধরনগুলি অবশ্যই কিছুটা, ও ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত ভূমিকাসীন হয়ে থাকে। আর এই অর্থে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উপায় উন্নয়ন ও সেগুলির ফলপ্রসূতা

বৃদ্ধি কোনক্রমেই নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। একইভাবে নেতৃস্থানীয় প্রশাসকদের আচরণের তাৎপর্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত জটিল, এমন কি সংকটজনক পরিস্থিতিতেও মোটেই ন্যূন নয়।

সেজন্য যাঁরা যুদ্ধরোধের এই দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেন তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করা যায়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে প্রাণগামূলক ব্যাপার এই যে তাঁরা ওই দিকগুলিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের একক কারণ না হলেও মূল কারণ ভেবে থাকেন।

সমাজবিকাশের বিখ্যাত নিয়মাবলীর আবিষ্কারক — মার্কসবাদ-লেনিনবাদই — যুদ্ধের উৎস ও তার সত্যিকার মূল কারণগুলি উদ্ঘাটনের নিয়মাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাল্পনিক নয়, বাস্তবিক ও ফলপ্রসূ সংগ্রামের সম্ভাব্যতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই দেখিয়েছে। যম্বারা যুদ্ধের গভীরতম মূল হেতুগুলি উৎপাটনরূপে সমাজ-জীবন থেকে তা নিশ্চিত করা যায়, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক তত্ত্ব সেই সামাজিক শক্তি ও উপায়গুলিই নির্ধারণ করেছে।

সমাজবিকাশের বিখ্যাত নিয়মাবলীর প্রভাবে তার ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদন-উপায়ে বিদ্যমান বিপরীত সম্পর্কের শ্রেণীসমূহে মানবসমাজের বিভাজন ঘটে। ফলত, উৎপাদন-উপায়গুলি একটি শ্রেণীর হস্তগত হয় এবং অন্য শ্রেণী উৎপাদন-উপায়ের মালিকানাহীন অবস্থায় বৈষয়িক মূল্যাসৃষ্টি করে। পরস্পরবিরোধী, আপসহীন স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীসমূহে সমাজের বিভাজন থেকেই বস্তুত যুদ্ধের উদ্ভব। যুদ্ধ হল শোষণভিত্তিক যাবতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনের নিত্যসঙ্গী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এইসঙ্গে শোষণমূলক সমাজে তা থেকে উৎপন্ন অসঙ্গতি এবং শ্রেণীসমূহের সম্পর্ক — এই সবই রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়। লেনিনের ভাষায় ‘রাজনীতি হল অর্থনীতিরই ঘনীভূত অভিব্যক্তি...’, ‘রাজনীতি হল শ্রেণীসমূহের মধ্যকার সম্পর্কগুলি’* রাজনৈতিক দল, সরকার, রাষ্ট্র ও সেগুলির নেতাদের কার্যকলাপের মধ্যেই রাজনীতি রূপলাভ করে। পরিশেষে, রাজনীতির আধেয় বস্তুত নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর মৌলস্বার্থ দ্বারাই নির্ধারিত। এই শ্রেণীটি রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী থাকাকালে নিজ প্রাধান্যের অর্থনৈতিক বিনিয়াদটি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে। সেজন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই হল শ্রেণীসংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং এরই ফলাফল নির্ধারণ করে: বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আনুযায়িক রাষ্ট্রীয় কাঠামো টিকে থাকবে ও মজবুত হবে, নাকি অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তা লোপ পাবে।

শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের রাজনীতি শান্তিপূর্ণ ও সহিংস উভয় উপায়েই বাস্তবায়িত হতে পারে। শোষোক্তগুলিরই একটি হল যুদ্ধ। লেনিনের ভাষায়, ‘যুদ্ধ সম্পর্কে দ্বন্দ্ববাদের মূল থিসিস হল এই যে ‘যুদ্ধ হল শৃঙ্খলিত অন্যতর’ [অর্থাৎ সহিংস] ‘উপায়ে রাজনীতি অব্যাহত রাখা...’ সর্বদাই তা ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের অবস্থান, যাঁদের মতে, প্রতিটি যুদ্ধই একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন শক্তি ও দেশের বিবিধ শ্রেণীর

* Lenin, V. I. *Collected Works*.—Moscow, Progress Publishers, 1965, Vol. 32, pp. 83, 228.

রাজনীতির অব্যাহত ধারা।' 'যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে যুদ্ধের উৎপত্তি, তা থেকে যুদ্ধ অবিভাজ্য।'*

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, যুদ্ধ কোনক্রমেই শৃঙ্খল রাষ্ট্রের অব্যাহত বৈদেশিক নীতি নয়। যুদ্ধ হল তার অব্যাহত অভ্যন্তরীণ নীতি এবং রাষ্ট্রভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অব্যাহত সম্পর্কও। 'বৈদেশিক নীতিকে' সাধারণ কর্মনীতি থেকে আলাদা করা, বা তদুপরি অভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গে বৈদেশিক নীতির প্রতিস্থাপনা—একটি মৌলিক ভ্রান্তি, একটি অমার্কসীয় ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা।** কর্মনীতি তো বস্তুত একটি রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর মৌলস্বার্থেরই অভিব্যক্তি। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড আসলে এই কর্মনীতি প্রয়োগের পরিমণ্ডল, শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে একটি অখণ্ড সমগ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তদুপরি, অভ্যন্তরীণ নীতি একটি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বিধায় শেষ্ঠবিচারে তা বৈদেশিক নীতিরও মূল দিকগুলির নির্ধারক বটে।

তাই, যাবতীয় শোষণমূলক সমাজে, যেখানে একের আধিপত্য ও অন্যের দাসত্ব ভিত্তিক শ্রেণীসম্পর্কের মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি প্রোথিত, সেখানে ওই সম্পর্কগুলি বৈদেশিক নীতির পরিমণ্ডলেও স্থানান্তরিত হয় এবং তা এই কর্মনীতির সহজ ও স্বাভাবিক গতি হিসাবেই যুদ্ধের উদ্ভব ঘটায়। লেনিনের মতে, যুদ্ধ হল সাধারণভাবে সকল শ্রেণীশাসনেরই এক অনিবার্য ও অবিচ্ছিন্ন সহগামী।

* Lenin, V. I. *Collected Works*, 1974, Vol. 21, p. 219; 1964, Vol. 24, p. 400.

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৪৩।

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পৌঁছানোর পরই যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন এবং যুদ্ধরোধের সম্ভাবনা সর্বশেষ প্রাসঙ্গিক ও জরুরি হয়ে উঠেছিল। এটা এজন্যই ঘটেছিল যে তখন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দমনমূলক স্বরূপ তার সর্বাধিক আক্রমণাত্মক বরনে প্রকটিত হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কর্মনীতিতে যুদ্ধের ভূমিকা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং এগুলির পরিসর ও সম্ভাব্য ধ্বংসের মাত্রা বিগত যুগের যুদ্ধগুলিকে বহুগুণ অতিক্রম করেছিল।

পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ বিশ্লেষণে লেনিন শেফোভের পাঁচটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছিলেন: ‘(১) উৎপাদন ও পুঁজির ঘনীভবন এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় যে অর্থনৈতিক জীবনে চূড়ান্ত ভূমিকাসীন একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে; (২) শিল্পপুঁজির সঙ্গে ব্যাংক-পুঁজির মিশ্রণজাত এবং এই ‘মহাজনী পুঁজির’ ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় মহাজনদের স্বেচ্ছাশ্রম; (৩) পণ্যরপ্তানি থেকে পৃথক পুঁজিরপ্তানি অত্যধিক গুরুত্বলাভ করে; (৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংঘ গঠিত হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে পৃথিবীকে ভাগবাটোয়ারা করে নেয় এবং (৫) বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্বের অঞ্চল-বিভাজন সম্পূর্ণ হয়ে যায়।’*

সাম্রাজ্যবাদের বিষয়গত এই দিকগুলি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কর্মনীতির আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধবাদী প্রবণতাগুলিকে নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। লেনিনের

* Lenin, V. I. *Collected Works*, 1974, Vol. 22, p. 266.

ভাষায়, মহাজনী পুঁজি ও একচেটিয়ারা সর্বত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। যেকোন রাজনৈতিক শাসনেই আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া মস্জাগত থাকে। জাতিগত নির্যাতন ও জবরদখলের প্রবণতা বিশেষভাবে তীব্র আকার ধারণ করে। যেকোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মহাজনী পুঁজি অনিবার্যভাবেই নিজের অর্থনৈতিক এলাকা বা সাধারণভাবে এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করে, এবং তা ‘...কাঁচামালের উৎসের সম্ভাবনা হিসাব করে এবং অবিভক্ত বিশ্বের অবশেষটুকু দখল, অথবা ইতিমধ্যে বিভক্ত অঞ্চলগুলির পুনর্বিভাগের মারাত্মক লড়াইয়ে পিছে পড়ে যায় এই ভয়ে, যেকোন জায়গায়, যেকোনভাবে, যথাসম্ভব বৃহত্তম এলাকা দখলের প্রয়াস পায়।’ অন্যদের দেশগুলি, মূলত উপনিবেশগুলি দখলের ইচ্ছার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি পুঁজিরপ্তানির চাহিদার দ্বারাও প্ররোচিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত লেনিনের মন্তব্যটি স্মরণীয়: ‘...উপনিবেশিক বাজারে প্রতিযোগী লোপের জন্য, নিশ্চিত সরবরাহের জন্য, প্রয়োজনীয় ‘সংযোগগুলির’ নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য একচেটিয়া পদ্ধতিগুলির (এবং কখনো কখনো প্রযোজ্য একমাত্র পদ্ধতিও বটে) প্রয়োগই সহজতর।’* দখলের মতো অবশিষ্ট কোন উপনিবেশ না থাকায় এবং প্রত্যেকটি কোন-না-কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের ‘অধিকারভুক্ত’ হওয়ায়, উপনিবেশ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা থেকেই শূন্য হয় উপনিবেশিক যুদ্ধ।

প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত সুসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে উল্লম্ব-গতির বিকাশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 22, p. 262.

হয়, কিছু রাষ্ট্র এগিয়ে যায়, অন্যরা পিছিয়ে পড়ে। অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিতন্ত্রের এক চরম নিয়ম — পুঁজিতান্ত্রিক বাস্তবতার বিশ্লেষণে এই হল লেনিনের সিদ্ধান্ত। তিনি লিখেছেন, ‘...পুঁজিতন্ত্রের আওতায় প্রভাবের পরিমণ্ডল, স্বার্থ, উপনিবেশ ইত্যাদি বিভাগের একমাত্র বোধ্য ভিত্তি হল ওইসব শরিকদের শক্তির হিসাব, সাধারণ অর্থনৈতিক, ফিনান্সিয়াল ও সামরিক শক্তি ইত্যাদি।’* অন্যত্র, ‘অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় শক্তির পরিবর্তন ঘটে।... যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্যিকার শক্তিপরীক্ষার অন্যতর কোন পথ নেই, থাকা সম্ভবও নয়।... পুঁজিতন্ত্রের আওতায় শিল্পে সংকট ও রাজনীতিতে যুদ্ধ ছাড়া পর্যায়িকভাবে বিঘ্নিত ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের অন্যতর কোন উপায় থাকে না।’**

তাই লেনিন বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে যুদ্ধের অনিবার্যতা পুঁজিপতিদের বিশেষ হিংসা, কুমতলব, বা তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার নয়। এ হল সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিষয়গত বিকাশেরই ফলশ্রুতি। এই ব্যবস্থার আওতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুণ্ডলির মধ্যকার এমন কি শান্তিচুক্তিও ‘...অনিবার্যভাবে যুদ্ধগুণ্ডলির অন্তর্বর্তীকালীন একটি সাময়িক ‘বিরতি’ ছাড়া কিছুই নয়। শান্তিসংঘগুণ্ডলি আসলে যুদ্ধেরই ভিত্তি সৃষ্টি করে এবং যথাক্রমে যুদ্ধ থেকেই জন্ম নেয়। বিশ্বঅর্থনীতি ও বিশ্বরাজনীতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী সংযোগ ও সম্পর্কগুণ্ডলির এক ও অভিন্ন

* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ২১, পৃঃ ৩৪১।

ভিত্তিতে পর্যায়েকভাবে শান্তিপূর্ণ ও অশান্তিপূর্ণ সংগ্রামের ধরনগুলি সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অন্যটিকে শর্তাধীন করে তোলে।*

পর্জিতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খোদ প্রকৃতির মধ্যে যুদ্ধের হেতুগুলির উপস্থিতি উন্মোচনের পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যুদ্ধের কারণগুলি দূর করা, তথা এভাবে যুদ্ধরোধের পথ ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটিমাত্র উপায় হল পর্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাত ও বদলি হিসাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্য, এই শেযোক্তের মজবুতি ও বিকাশে যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন।

প্রমিক শ্রেণীর কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর সহ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল পর্জিতন্ত্র উৎখাত তথা যুদ্ধলুপ্তির একমাত্র উপায়। মার্কসের ভাষায়, 'অর্থনৈতিক দৃশ্য ও রাজনৈতিক প্রলাপ সহ পূরনো সমাজ থেকে পৃথক একটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করছে, যার আন্তর্জাতিক নীতি হবে শান্তি, কেননা প্রত্যেকটি জাতির একই ও অভিন্ন প্রভু হবে — শ্রম!'** সমাজতন্ত্রীরা, যে জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধকে সর্বদাই বর্বরতা, নৃশংসতা হিসাবে নিন্দা করেছে তা উল্লেখক্রমে লেনিন লিখেছেন, '...একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্তর্পস্থিতিতে জ্বরদখল ছাড়া, জাতিসমূহের নির্যাতন ছাড়া, লুণ্ঠন ছাড়া এবং বর্তমান সরকার ও শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে বিদ্যমান

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 22, p. 295.

** The General Council of the First International 1870-1871.—Moscow, Progress Publishers, 1974, p. 328.

নতুন যুদ্ধের ভ্রূণ ছাড়া যে শান্তি সম্ভব — এমন ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়ে তারা জনগণকে প্রতারণা করবে না।*

অক্টোবর বিপ্লবের আগের লেখায় এবং যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক লেনিনের যাবতীয় রচনায় বার বার যে-প্রসঙ্গটি পুনরাবৃত্ত, তা হল: 'পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লব ব্যতীত সকল দেশের পুঁজিপতিদের সৃষ্ট যুদ্ধের অবসান সম্পূর্ণ অসম্ভব।... শাসকশ্রেণীই যুদ্ধের উদ্গাতা, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবই কেবল তার অবসান ঘটাতে পারে'।**

এইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট যুদ্ধপ্রস্তুতিতে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি বাধা দেবে না, এমন দৃষ্টিভঙ্গি লেনিন কখনই সমর্থন করেন নি। তিনি এই লড়াইকে শ্রমিক শ্রেণীর, সকল মেহনতির একটি কর্তব্য হিসাবেই দেখেছেন। তিনি মনে করতেন যে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই লড়াই সফল হতে পারে, অর্থাৎ প্রস্তুতিপর্বে একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধরোধ সম্ভব হবে। কিন্তু পূর্ণ যুদ্ধলড়াপি থেকে তা বহুদূরে অবস্থিত। 'সমাজের শ্রেণীবিভাজন সম্পূর্ণ উচ্ছেদের মাধ্যমেই যে কেবল যুদ্ধলোপ সম্ভব তা মূহুর্তের জন্যও না ভুলে প্রলেতারিয়েত যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করছে ও সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাবে...***। লেনিনের মতে, পুঁজিতন্ত্রের বিদ্যমানতায় শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত ও সচেতন আন্দোলনই কেবল শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ যুদ্ধকে অন্যতর উপায়ে

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 21, pp. 315-316.

** প্রাগদুত, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪১৬, ৪২০।

*** প্রাগদুত, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৬৮।

রাজনীতির ধারা হিসাবে দেখে, তার মতে প্রতিটি যুদ্ধের প্রকৃতি রাজনীতির অনুসৃত ধারা দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রতিটি নির্দিষ্ট যুদ্ধসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যা কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তা হল ‘...একটি মূল প্রশ্ন: একটি যুদ্ধের শ্রেণীচারণা কী, কীসে যুদ্ধ ঘটাল, কোন শ্রেণী যুদ্ধ চালাচ্ছে, কীসব ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তা সৃষ্টি করেছে।... আমরা বলি: একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অর্জনেই আমাদের লক্ষ্য, যে-সমাজ মানুষের শ্রেণীবিভাজন উচ্ছেদ করে, মানুষ কর্তৃক মানুষ, জাতি কর্তৃক জাতি শোষণ উৎখাত করে অনিবার্যভাবে যুদ্ধের প্রতিটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু ওই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অর্জনের যুদ্ধে জয়ী হতে হলে আমরা সেইসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য, যেগুলির অধীনে প্রতিটি পৃথক জাতির মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রাম বিভিন্ন জাতির মধ্যকার যুদ্ধের মূখ্যমুখি হতে পারে, যে-যুদ্ধ ওই শ্রেণীসংগ্রাম থেকে উদ্ভূত।’*

‘...গৃহযুদ্ধ, অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর যুদ্ধ, দাসমালিকদের বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের যুদ্ধ, জমিদারদের বিরুদ্ধে ভূমিদাসদের যুদ্ধ এবং বর্জ্যের বিরুদ্ধে মজদুর-শ্রমিকদের যুদ্ধ, আমাদের মতে সম্পূর্ণ ন্যায্য, প্রগতিশীল ও প্রয়োজনীয়।’** তদ্রূপ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে বৈদেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক মূল্যবুদ্ধি এবং

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 24, pp. 398-399.

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ২১, পৃঃ ২৯৯।

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রক্ষার যুদ্ধও তেমনি ন্যায্য ও আইনসিদ্ধ।

প্রতিটি যুদ্ধের কারণগুলির অনুপদ্রুত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মনে করে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার যুদ্ধও পরিস্থিতির নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন চারিত্র্যের হতে পারে। ‘...শ্রেণীশাসনের অব্যাহত বিদ্যমানতার প্রেক্ষিতে কেবল ভাবপ্রবণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যুদ্ধ বিচার্য নয়।... শোষক জাতিগুলির মধ্যকার যুদ্ধে প্রতিটি জাতির প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার ভূমিকার পার্থক্য নির্ধারণও আবশ্যকীয়।’*

ন্যায্য ও অন্যায্য যুদ্ধগুলির মধ্যকার পার্থক্যনির্ণয় সহ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা: শ্রেণীশাসনের ব্যবস্থা দ্বারা, প্রাক-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণমূলক প্রকৃতি দ্বারাই এই যুদ্ধদুটি সঞ্চিত। এ তো সমাজের রূপান্তর ঘটানোর (যা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য) জন্য শোষিতের উদ্যোগে সঞ্চিত গৃহযুদ্ধ নয়। এ হল এই অনিবার্যকে সশস্ত্র-ভাবে প্রতিরোধের জন্য শোষকদের প্রচেষ্টা। জনগণের মর্দত্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে জাতীয় মর্দত্তিযুদ্ধ দেখা দেয় না। এই যুদ্ধ আসে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দ্বারা সৈন্যবাহিনী ব্যবহার সহ সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই আকাঙ্ক্ষা অবদমনের চেষ্টা থেকে, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ব্যবস্থা অটুট রাখার ইচ্ছা থেকে। খোদ বিপ্লব নয়, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক যুদ্ধের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র উচ্ছেদের চেষ্টা থেকেই আসলে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও

* প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ: ২৬৮।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার যুদ্ধগুলি উদ্ভূত।

মেহনতিদের ভয় দেখিয়ে বশে আনার জন্য বুদ্ধজোয়া ও সুবিধাবাদী ভাবাদর্শরা সর্বদাই এই অভিযোগটি উত্থাপন করেন যে কেবল সামাজিক ও জাতীয় মুক্তিবিপ্লব থেকে প্রায় অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র সংঘাত ও যুদ্ধ বাধে। জনসমক্ষে একটি ভ্রান্ত উভয়সংকট উপস্থাপিত হয়: একদিকে বিপ্লবের পথে যুদ্ধের অনিবার্য ঝুঁকি, অন্যদিকে অটুট শান্তির জন্য বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বর্জন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা, কমিউনিস্টরা এই ধরনের উভয়সংকটের মূখোমুখি হয় না। কেননা তারা সন্নিশ্চিত (এবং তাদের বিশ্বাস বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক) যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হল একইসঙ্গে যুদ্ধলোপের পরিস্থিতি সৃষ্টির সংগ্রামও।

শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতাসীন হলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তথা স্থায়ী, ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য মেহনতিদের লড়াই সর্বাধিক কার্যকর হয়ে ওঠে। লেনিনের ভাষায়, ‘ক্ষমতাসীন হলে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই শান্তির কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারবে, যুদ্ধের বদলিতে নয়... সত্যিকার কাজে।’* শ্রমিক শ্রেণীর জন্য এই সদুযোগটি প্রথম এসেছিল ১৯১৭ সালে, রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়লাভের পর।

* প্রাগুক্ত, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩১৯।

দুই। যুদ্ধলড়াপ্তর সংগ্রামে প্রথম বিজয়

লেনিন রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবকে যুদ্ধলড়াপ্তর সংগ্রামে প্রথম বিজয়* হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তারপর অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর, যার ফলে মেহনতি শাসিত রাষ্ট্রসমূহের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, — এই সবই যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা মোকাবিলায় আমলে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নিজ লক্ষ্যে সকল মেহনতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পর নিজ ক্ষমতা অটুট রাখা ও স্বীয় লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন যুদ্ধ নয়, অবিচল ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। ‘...যেকোন শান্তি আমাদের প্রভাবের পথকে শতগুণ প্রশস্ততর করবে,’** লিখেছেন লেনিন।

বিশ্বসমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধরোধের সমস্যা মোকাবিলারও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত প্রাধান্যের কালপর্বে তার আগ্রাসন বা মজ্জাগত যুদ্ধলিপ্সরোধে সক্ষম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আকারে কোন শ্রেণীশক্তি বিদ্যমান ছিল না। ১৯১৭ সালে

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 56.

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৪৫৩।

এই শক্তির উদ্ভব ঘটে। তাই যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা সমাধান অতঃপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের স্বল্পের পরিমন্ডলে স্থানান্তরিত হয়। সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্য যতই বদলায়, শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনে মানুষের আশার যথার্থ্যও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গৃহীত প্রথম বিধানিক দলিলটি ছিল শান্তির ডিক্রি। এটা ছিল প্যারোদমে চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) সমাপ্তির জন্য সম্ভাব্য করণীয় সবকিছু সহ জনগণের পরম স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিশীল। একসঙ্গে, শান্তির ডিক্রিটি ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সূত্রসমূহ বিশদকারী একটি মূল দলিল। আজও এগুনি ঐতিহাসিক তাৎপর্য হারায় নি।

প্রথমত, ডিক্রি ঘোষণা করেছিল যে, শান্তি যথার্থ হতে হলে তা শৃঙ্খল বৃদ্ধির অনুপস্থিতি নয়, অবশ্যই হবে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক। ডিক্রি দেখিয়েছিল যে 'ন্যায্য বা গণতান্ত্রিক শান্তি বলতে সরকার বোঝাতে চায় জবরদখল ছাড়া (অর্থাৎ ভিনদেশের জমিদখল ছাড়া, পরদেশী জাতিগুলিকে বলপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া), ক্ষতিপূরণ ছাড়া আশু শান্তি।' এই সাধারণ শর্তটি বিশদক্রমে ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার যে-ইঙ্গিত দিয়েছিল তা হল: সাধারণভাবে গণতন্ত্রের ও বিশেষভাবে মেহনতি শ্রেণীর বৈধ নীতিবোধ অনুসারে পরদেশ সংযুক্তি বা দখল বলতে বোঝায় — অনুষ্ঠিত জবরদখলের সময় নির্বিশেষে, একটি রাষ্ট্রে সবলে যুক্ত অথবা তার সীমানায় সবলে আবদ্ধ জাতির অগ্রগতি বা অনগ্রসরতার মান নির্বিশেষে এবং পরিশেষে, ইউরোপ বা সাগরপারের দূরদেশে সেই জাতির অবস্থান নির্বিশেষে ওই জাতির সঠিক,

সম্পদ ও স্বৈচ্ছাদত্ত সম্মতি আর ইচ্ছা ছাড়া প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বা দুর্বল জনগোষ্ঠীর একটি বড় বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি। শান্তির ডিক্রিতে ছিল আক্রমণ ও অন্য জাতিগুলিকে অধীনস্থ করার যাবতীয় ধরন পুরোপুরি পরিত্যাগ, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রায়োগিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, ঔপনিবেশিকতা উচ্ছেদ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল জাতির সমতা।

সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার কর্তৃক তার প্রথম ডিক্রিতে ঘোষিত নীতিটি পরবর্তীতে তার স্বীকৃতির জন্য কয়েক দশক সংগ্রামের পর আন্তর্জাতিক আইনের একটি স্বীকৃত নীতি হয়ে উঠেছিল। এটা হল আক্রমণাত্মক ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধের অপরাধসিদ্ধতার নীতি। শান্তির ডিক্রি অনুসারে সরকারের অভিমত: বিজিত দুর্বল জাতিসমূহকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে ভাগ করার বিষয়টি নিয়ে এই যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হল মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী শ্রমিক-কৃষকের সরকার জানত যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি স্বৈচ্ছায় ন্যায় ও গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেবে না। এজন্য সে শান্তিপ্ৰস্তাব নিবেদন করেছে সরকারগুলি ছাড়াও জনগণের, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধের শরিক বৃহত্তম দেশসমূহের, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের কাছে। রাশিয়ার মেহনতিদের সরকার শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের দাসত্ব থেকে, সব ধরনের শোষণ থেকে শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের মর্দান্ত-আদায়ে সহায়তা যোগাতে সেই দেশের প্রলেতারিয়েতকে আহ্বান জানিয়েছিল। ভাষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক সরকার তার প্রথম বৈদেশিক নীতির দাঁলে

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জনগণের একটি ব্যাপক, চূড়ান্ত ও অনমনীয় উদ্যোগের গুরুত্ব দেখিয়েছিল।

একইসঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের পর লেনিনের নেতৃত্বাধীন সরকার অবগত ছিল যে বাস্তব অর্থে যুদ্ধলোপের সমস্যাটি পূর্জিতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলির সঙ্গে একযোগে সমাধান করা প্রয়োজন। যথাসম্ভব শীঘ্র যুদ্ধলোপের প্রয়াস এবং বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়নের পর সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করেছিল যে তার শান্তির শর্তগুলি অবশ্যই শেষকথা হিসাবে বিবেচ্য নয়। শান্তি-ডিক্রি মোতাবেক সে ‘...শান্তির অন্যতর যেকোন শর্ত বিবেচনায় প্রস্তুত’ এবং কেবল চায় যে ‘যথাসম্ভব দ্রুত যেকোন যুদ্ধরত দেশ সেগুলি উত্থাপন করুক, শান্তিপ্রস্তাবগুলি চূড়ান্ত রকমের স্বচ্ছ এবং পুরোপুরি স্বার্থতা ও গোপনীয়তা মন্ডিত হোক।’ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন জোর দিয়েছেন, ‘জ্বরদখলহীন ও ক্ষতিপূরণহীন আমাদের শান্তিকর্মসূচির পুরোটার ব্যাপারে আমরা অবশ্যই অটল থাকব। আমরা তা থেকে পিছন হটব না। কিন্তু তাদের শর্তগুলি আমাদের থেকে আলাদা বিধায় আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অর্থহীন — এমন অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ আমরা শত্রুদের দেব না। না, আমরা তাদের এই সুবিধাজনক অবস্থান থেকে বঞ্চিত করব এবং আমাদের শর্তগুলিকে শেষকথার ধরনে উপস্থিত করব না... যেসব সরকার কেবল মুখেই শান্তি ও ন্যায়ের কথা বলে এবং কার্যত জ্বরদখল ও

আগ্রমণাত্মক যুদ্ধ চালায় আমরা তাদের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই।*

তাই লেনিন সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক কর্মনীতির আরেকটি নীতি উপস্থাপিত করেন, যা আজো তার একটিও প্রায়োগিকতা হারায় নি। তা হল: নীতির অবস্থানে অটল থেকে, তাকে সমর্থন ও রক্ষা করে, এই অবস্থান যে ন্যায্য ও শুদ্ধ তা জনগণকে বদ্বিষয়ে, সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতির প্রতারণা ও বিপদ জনসমক্ষে স্পষ্ট করে তুলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সমাধানে অনড় থাকা।

শান্তির ডিক্রি বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সরকারের সম্পাদিত সকল গোপন চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেছিল। কেননা, ওই ডিক্রি মোতাবেক ওইসব চুক্তির অন্তর্গত সবকিছুই ছিল রাশিয়ার জমিদার ও পুঁজিপতিদের সদুযোগ ও সুবিধাগুলি অটুট রাখার লক্ষ্যমুখীন। এটা ছিল সর্বকালের মধ্যে এই প্রথম অন্যায় চুক্তিগুলি অস্বীকার করার নীতির ঘোষণা ও প্রথম বাস্তব প্রয়োগ। লক্ষণীয়, নীতিটি আজও সৌভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক কর্মনীতির ভিত্তিস্তম্ভ। নীতিটি ইদানীংকার আন্তর্জাতিক আইনের অনুষঙ্গও বটে।

লেনিন আরও দেখিয়েছিলেন যে ‘...লুণ্ঠনজীবী সরকারগুলি লুণ্ঠনের ব্যাপারেই কেবল নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নি, এগুলিতে অর্থনৈতিক চুক্তি ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের অন্যান্য নানা ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে... আমরা লুণ্ঠন ও হিংস্রতার যাবতীয় ধারা প্রত্যাখ্যান করি,

* Lenin, V. I. *Collected Works*, 1977, Vol. 26, p. 252.

কিন্তু সদুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও যাবতীয় অর্থনৈতিক চুক্তির শর্তাবলীর আনুযায়িক সবগুণি ধারাকেই স্বাগত জানাই। আমরা এগুলি নাকচ করতে পারি না।*

এভাবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজ অস্তিত্বের প্রথম দিনেই বিশ্বযুদ্ধ অবসান এবং ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য একইসঙ্গে বাস্তব ও নমনীয় নীতির একটি কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছিল। ‘...শান্তির লড়াই শুরু হচ্ছে,’ লেনিন বলেছিলেন। ‘এটা হবে এক কঠিন ও অটল লড়াই। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বিরুদ্ধে তার সর্বশক্তি সংহত করছে।’**

ঠিক তাই ঘটেছিল। কেননা যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা সমাধানের পৃথক, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুটি বিরোধী সমাজব্যবস্থা, পুঁজিতন্ত্র ও সদ্যজাত সমাজতন্ত্রের বিরোধেরই প্রতিফলন। তৎকালে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা নিজেদের মান অনুযায়ী যথার্থ যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে বিরোধীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মোটেই সম্ভবপর নয় আর সেজন্য নতুন সমাজব্যবস্থাকে অঙ্কুরেই নাশের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাৱশ্যকীয়। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রায়োগিক কর্মনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মূলনীতি হয়েই আছে।

গোড়ার দিকে কাজটি তাদের কাছে সহজসাধ্য হিসাবেই প্রকটিত হয়েছিল। দরিদ্র ও অনগ্রসর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

* প্রাগদুঃ, পৃঃ ২৫৫।

** প্রাগদুঃ, পৃঃ ৩১৭।

রক্তশ্রান ও ধ্বংসের এবং গৃহযুদ্ধের লুটপাটের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলির ও তাদের মিত্রবর্গের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ শুরুর করল। সমাজতন্ত্রবিরোধী ধর্মযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের সীমান্তে সেই মহাদূতের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত সৈন্যদলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এক সময় মৃত্ত সোভিয়েত রাশিয়ার এলাকা কয়েকটি জেলার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছিল এবং নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্বেগ কার্যত নিষ্পন্ন হয়েছে — পশ্চিমের শক্তিগুলি এমনটি ভেবেছিল।

তারপরই অলৌকিক ব্যাপারটি ঘটল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মান অনুসারে তা ছিল একান্তই অসম্ভব। ঘেরাও দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ ও বাহিরের উল্লেখ্য বৈষয়িক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও, ক্ষুধা ও মহামারীর আক্রমণের মধ্যে বেপরোয়া লড়াই এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রায় সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া কয়েক বছর পর্যন্ত একের পর একটি বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করেছে এবং পরিশেষে অশেষ আত্মত্যাগ, দুঃখভোগ ও গণশোষণের বিনিময়ে নিজ স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়েছে।

ব্যাপারটি অলৌকিক হলেও অবশ্যই অতিপ্রাকৃত নয়। কাজটি নিষ্পন্ন করেছে এমন সব মানুষ যারা সমাজবিকাশের আপাত নিয়মাবলীর বদলে আয়ত্ত করেছে তার সত্যিকার নিয়মগুলি, যারা এইসব নিয়মের ভিত্তিতে কার্যকর একটি পার্টি গঠনে ঐক্যবদ্ধ, যেজন্য নবজাত সমাজরক্ষার সংগ্রামে সকল মেহনতিকে সম্বলিত করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। লেনিনের ভাষায়, ‘এজন্যই, অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের তুলনায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অপরিমেয় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আমরা একইসঙ্গে আবার অধিক

শক্তিশালীও, কেননা এই সাম্রাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলা থেকে, এই রক্তাক্ত জটিলতা থেকে, ...যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তারা জড়িয়ে পড়েছে এবং আরও গভীরভাবে বিজড়িত হচ্ছে আর যা-থেকে তারা মুক্তির কোন পথ দেখে না, ওইসব থেকে যাকিছু উদ্ভূত হয়েছে ও অবশ্যই হবে সেসম্পর্কে আমরা সচেতন ও সেগুলির সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম।*

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বৈদেশিক ও দেশিক নীতি ছিল এই বিশ্বাসভিত্তিক যে এখনো শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বপুঞ্জিতন্ত্র তার ঐতিহাসিক পতনের দিকেই এগিয়ে চলেছে। পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার আসলে ইতিহাস কর্তৃক চরম দণ্ডপ্রাপ্ত একটি ব্যবস্থাকেই রক্ষা করছে। তাদের কাছে এমন ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক, বাস্তবে ভিত্তিহীন। পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবিধ্বংসী — এই বিশ্বাসে তারা একটি নিষ্ফলা ও মারাত্মক বৈদেশিক নীতির পথ বেছে নিয়েছিল। জন্মলগ্নে সমাজতন্ত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করার পরিকল্পনার করণ ব্যর্থতা ছিল এই পথের অন্যতম সেরা বিপত্তি। লেনিনের কথায়, ‘...পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কৃত আমাদের হিসাবগুলি ছিল ওদের তুলনায় শুদ্ধতর। শুদ্ধ হিসাবক্ষম লোকের অভাবের জন্য এমনটি ঘটে নি। বরং উল্টো। এমন লোক আমাদের তুলনায় ওদের অনেক বেশিই রয়েছে। ধ্বংসাত্মকতার পক্ষে এমন শুদ্ধ হিসাব অসম্ভব বলেই তা ঘটেছে।’**

লেনিনের শুদ্ধ পূর্বানুমান অনুসারেই বৈদেশিক হামলার যাবতীয় পরীক্ষা ও কষ্টভোগ থেকে উত্তীর্ণ সোভিয়েত

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 146.

** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪।

রাশিয়া তার বহু বছরের অত্যাচারী বহির্বিষয়ের দেশগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় নি। স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা ও পরকীয়তা ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈমানান। সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশকে কেবল তার সরকার ও শাসক শ্রেণীর নিরিখেই নয়, সেইদেশের নির্যাতিত জনতিকেও দেখেছে। সোভিয়েত রাশিয়া জানত যে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান 'রাশিয়া থেকে হাত সরাও!' নামের শক্তিশালী আন্দোলনটি বৈদেশিক হামলার বিরুদ্ধে জয়লাভে তাকে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সকল দেশের মেহনতিদের সমর্থনকে নিজের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব, বিকাশ ও মজবুতির নিশ্চয়ক হিসাবেই ভেবেছে। সে পরিচালিত হয়েছে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের একটি মূলনীতি, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে, যার ধ্রুপদী সূত্র: 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'।

পক্ষান্তরে, সোভিয়েত সরকার ভালই জানত যে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে বিরোধকীর্ণ সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি ওই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারগুলির সঙ্গে তাকে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা ও চুক্তিতে অবশ্যই শরিক হতে হবে। তৎকালে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ওইসব রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে কমিউনিস্টরা তাদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবেই দেখেছিল।

শান্তিনীতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্য কোন আপাতিক বা পরিস্থিতিগত ব্যাপার ছিল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোদ প্রকৃতি দ্বারা, ক্ষমতাসীন শ্রমিক শ্রেণী এবং প্রলেতারীয়

ভাবাদর্শকে বাস্তব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরকারী তার পার্টির আদর্শ দ্বারাই তা নির্ধারিত হয়েছিল।

একইসঙ্গে সোভিয়েত দেশ বিদ্যমান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ার প্রেক্ষিতে এই নীতিটি বাস্তবায়িত হচ্ছিল। তাকে ঘিরে ছিল পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও উপনিবেশ কিংবা প্রভাবাধীন অঞ্চলগর্ভিত। তাই, বিপরীত ব্যবস্থাধীন দেশগুলির — যেখানে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগর্ভিত ক্ষমতাসীন — সম্পর্কের ধরনের সমস্যাটি বিশ্বরাজনীতির আলোচ্যসূচির শীর্ষে অবস্থান করত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োগের জন্যই শুধু নয়, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বীয় দিক থেকেও সমস্যাটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। ব্যাপারটি এই যে, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের শিক্ষা এমন এক কালপর্যায়ের বিশদীকৃত হয়েছিল যখন প্রধান প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি ছিল মোটামুটি সমপর্যায়ের বিকশিত। তাই কয়েকটি অত্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে একইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। এঙ্গেলসের ভাষায়, 'ইতিমধ্যেই বিশ্ববাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প দুনিয়ার মানুষকে, বিশেষত সভ্য জাতিগুলিকে এতটা ঘনিষ্ঠ করেছিল যে একটি জাতি অন্যটির সংঘটিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল ছিল। তদুপরি সবগুলি সভ্য দেশেই বৃহদায়তন শিল্প সমাজবিকাশকে এতটা সুসম করেছিল যে ওই সবগুলি দেশেই বুদ্ধিজীবী ও প্রলেতারিয়েত বস্তুত সমাজের দুটি চূড়ান্ত শ্রেণী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যকার সংগ্রাম একালের প্রধান সংগ্রামের রূপলাভ করেছিল। তাই কমিউনিস্ট বিপ্লব আর কেবল জাতীয় ঘটনা হয়ে থাকবে না। এটা হবে সবগুলি সভ্যদেশে, অর্থাৎ অন্তত ইংল্যান্ড,

আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানিতে একইসঙ্গে সংঘটিত বিপ্লব।*

১৯১৫-১৬ সালে, কিছু সংখ্যক পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুতীর অসম বিকাশের একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ওগুন্দির কয়েকটি, এমন কি একটিতেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সম্ভবপর।

লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক অবদান হল: নিজেদের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন এই সমস্যার জটিলতা অবহিত থেকে তাঁরা এমনভাবে তার সমাধানের দিকে এগিয়েছেন যা গতানুগতিক, অস্বাভাবিক ছিল না। জার্মান সমকালীন বাস্তবতার ও বিশ্বপারিসরে বিদ্যমান শ্রেণীশক্তিগুণের ভারসাম্য বিশ্লেষণক্রমে লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে পুঁজিতান্ত্রিক পরিবেশে একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকাল টিকে থাকা অবশ্যই সম্ভব এবং তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একাধারে সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয়।

বিপরীত সমাজব্যবস্থাপ্রধান রাষ্ট্রগুণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বলতে লেনিন প্রথমত ও প্রধানত তাদের মধ্যে যুদ্ধহীনতাই বুদ্ধতেন। এবং আরও কিছু। শান্তির ডিক্রির বিবৃতি অনুসারে শান্তি হবে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক, একের আধিপত্য ও অন্যদের দাসত্ব নয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে লেনিনের ধারণা ছিল বাস্তব পূর্বানুমানভিত্তিক, যেখানে সহাবস্থানের অন্তর্গত ছিল

* Engels F. 'Principles of Communism', in: Marx K. and Engels F., *Collected Works*.—Moscow, Progress Publishers, 1976, Vol. 6, p. 352.

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক ও পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যকার চুক্তিগুলি। লেনিন দেখিয়েছেন, ‘...আমরা ও পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ব্যতীত আমাদের পক্ষে স্থায়ী অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে তাদের পক্ষেও তা অসম্ভব বটে।’*

একটি সমদর্শী চুক্তি, একটি যুক্তিসঙ্গত আপস এবং কিছু শর্তাধীন একটি সমঝোতা — সবই প্রতিটি পক্ষের জন্য কিছুটা লাভজনক, তার স্বার্থের স্বীকৃতি। ‘কোন পক্ষ মোটেই লাভবান না হলে আপস অবশ্যই অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং তা বলাই বাহুল্য।’** সমকালীন আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় এই সাধারণ অনূর্বিধ আরোপের ব্যাপারে লেনিন অনাবিল ও দ্ব্যর্থহীন ছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি অবশ্যই পরিচালিত হবে এমনভাবে যাতে পুঞ্জিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শান্তির স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে রাজনৈতিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে উৎসাহী হয় এবং একইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করে। তাঁর ভাষায়, ‘পুঞ্জিতান্ত্রিক পরিবেশে কীভাবে আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায়, শত্রুদের কাছ থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় — আমাদের অবশ্যই তার হিসাব-নিকাশ করতে হবে’। তিনি অবশ্য আরও বলেছেন যে আমাদের ‘পুঞ্জিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে এতবোশি সুবিধা দিতে হবে যে আমাদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেকোনো রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 151.

** প্রাগদত্ত, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩১১।

যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও লেনদেনে বাধা হয়’*। শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লেনিনের হুঁশিয়ারি: ‘...আজ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে যতটা নমনীয়তা আমরা দেখিয়েছি আমাদের অবশ্যই ততোধিক নমনীয়তা দেখাতে হবে... পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে খাপখাওয়ার সুবিধাগুলি হল সেই সুবিধামালা, যা তাদের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য দেয়, তাদের মনোমালিন্য নিশ্চরতা যোগায়, যা কখনো হয়ত-বা ন্যায্য অঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি।’**

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় প্রত্যয়ে যে বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ধারণা অন্তর্ভুক্ত, উপরোক্ত বক্তব্যেই তা সহজলক্ষ্য। ‘আমাদের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কেন অনন্তকাল ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে না আমি তার কোন কারণ দেখি না,’*** বলেছিলেন লেনিন।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের বিশদীকরণের ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সময় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহাবস্থানের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়ে লেনিন অটলভাবে শ্রেণীগত ও আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আওতায় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাগুলির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের যে

* প্রাগদত্ত, খণ্ড ৩৩, পৃ: ৪৪০, ৪৪১।

** প্রাগদত্ত, পৃ: ৪৩৯-৪৪০।

*** প্রাগদত্ত, খণ্ড ৪২, পৃ: ১৭৭।

অবসান ঘটে না, তিনি তাও দেখান। তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে এমন কি শান্তির সময়ও সমাজতন্ত্র এবং পূর্নজিতন্ত্রের সম্পর্ক হল একটি 'যুদ্ধ'ও, অর্থাৎ বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যকার লড়াই। 'ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলত সেই ক্ষেত্রে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, সামরিক ক্ষেত্রে... তাসত্ত্বেও আমরা এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করেছি, আমরা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি, অর্থনৈতিক যুদ্ধে যোগ দিচ্ছি... ওটাও এক ধরনের যুদ্ধ বৈকি, দু'টি পদ্ধতির, দু'টি রাজনৈতিক ব্যবস্থার, দু'টি অর্থনীতির — কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট পদ্ধতির মধ্যকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ... যারা নিজেদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, দমনমূলক শাসন তাদের বিরুদ্ধেই ফলপ্রসূ। কিন্তু, এই পর্যায়ে বলপ্রয়োগের তাৎপর্য শেষ হয়ে যায় এবং অতঃপর প্রভাব ও দৃষ্টান্তই কেবল কার্যকর থাকে।'* শান্তিপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক নীতির শ্রেণীগত মর্মবস্তু বিশদক্রমে লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, '...সার্বিক বিশ্বস্ততা সহকারে, যথাসময়ে শান্তির নীতিতে অবস্থান বদলানোর জন্য বলপ্রয়োগে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমরা আমাদের সামর্থ্য প্রমাণ করেছিলাম... আমাদের একমাত্র প্রজাতন্ত্রটিই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আর বলপ্রয়োগ ছাড়া সকল পরিস্থিতির সম্মুখভায়ে সক্ষম এবং সে বলপ্রয়োগ অস্বীকার করেও জয়লাভে সমর্থ।'***

* Lenin, V. I. *Collected Works*, 1977, Vol. 31, pp. 456, 457.

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩১৮, ৩২৬।

তাই, লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বর্জন কোনক্রমেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম বর্জন নয়। এই অপরিহার্য সংগ্রামের ধরন ছাড়া আর কিছুই বদলাবে না। শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, তাঁর মতে, ‘আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিপ্লবে আমাদের মূল প্রভাব প্রয়োগ করছি... এক্ষেত্রে সংগ্রাম এখন বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। একবার সমস্যাটি সমাধান করতে পারলে আন্তর্জাতিক পরিসরে আমরা অবশ্যই ও পরিশেষে জয়ী হব...’ কাজটিকে লেনিন যথেষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ভেবেছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি: ‘এই রণাঙ্গনে অবিরাম উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব, যা নিশ্চিতই হবে পর্বায়িক ও মন্থর, ত্বরান্বিত নিষিদ্ধ।’*

এখানে জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, লেনিন ‘বিপ্লব রপ্তানি’ কখনই সমর্থন করতেন না। অন্যান্য দেশে বিপ্লব ‘গাঁজানোর’ উদ্যোগের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অটল বিরোধী। তিনি এই প্রশ্নটিকে যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার সঙ্গে সরাসর যুক্ত করেছিলেন। যারা মনে করত যে বিশ্ববিপ্লবের জন্য একটি ‘ধাক্কা’ প্রয়োজন, সেসম্পর্কে লেনিন বলেছেন, এমন ‘ধাক্কা’ ‘...কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই দেয়া যায়, কখনই শান্তির মাধ্যমে নয়, যাতে মানদুষের মনে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদকে কি ‘বৈধ’ করা হচ্ছে? এমন ‘তত্ত্ব’মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। কেননা, মার্কসবাদ সর্বদাই বিপ্লবকে ‘ধাক্কা’ দেয়ার বিরোধী। বিপ্লব বিকশিত হয় বিপ্লবের স্রষ্টা শ্রেণীদ্বন্দের বর্ধমান তীব্রতার মধ্যে।’**

* Lenin, V. I. *Collected Works*, 1965, Vol. 32, p. 437.

** প্রাগদুস্ত, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৭১-৭২।

লেনিন দেখিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশেও সহায়তা যোগায়, কেননা, এটাই সাম্রাজ্যবাদী বৃজ্জোঁয়া কর্তৃক তার সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকে সারা জাতির স্বার্থ হিসাবে দেখানোর চেষ্টাকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অন্যান্য নেতিবাচক ফলাফলগুলি বাদ দিলেও, লেনিনের ভাষায়, যুদ্ধের একটি নিহিতার্থ হল ‘...অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট থেকে মেহনতি জনসাধারণের দৃষ্টিবিক্ষেপ ঘটান... শ্রমিকদের ঐক্যনাশ ও জাতীয়তাবাদের মৌতাতে বুদ্ধিনাশ এবং প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য তাদের অগ্রগামীদের ধ্বংস সাধন...’*।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার শ্রেণীদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কীভাবে তা অর্জন সম্ভব লেনিন একসঙ্গে সেইসব উপাদান চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, লক্ষণীয় যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে বলার সময় সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক প্রকৃতি বদলের সম্ভাবনা লেনিন কখনই আশা করেন নি। পক্ষান্তরে, একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে অন্যান্য দেশের বৃজ্জোঁয়ারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রলেতারিয়েতের বিজয়কে যে পণ্ড করতে বাধ্য হবে সেসম্পর্কে লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অন্যান্য বিবেচনা ছাড়াও তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেই এতে প্ররোচিত হবে। ‘...শোষণের অনিবার্যভাবে পুনরুদ্ধারের আশা পোষণ করে

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 21, p. 27.

এবং এই আশা' পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা 'পুনরুদ্ধারে উদ্যোগের রূপলাভ করে'*।

লেনিনের মতে, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক আকাঙ্ক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সামরিক উপায়ে মীমাংসার চেষ্টারোধে সমর্থ মূল শক্তি হল খোদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার আছে নৈতিক ও রাজনৈতিক সুনাম, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং তার আদর্শভিত্তিক, বাস্তববাদী একটি বৈদেশিক নীতি। এক্ষেত্রে সত্যিকার বিদ্যমান শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য যে চরম গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কেও লেনিন হুঁশিয়ার দিয়েছিলেন।

উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের একটি অংশ বিবেচনা করে লেনিন তার উন্নয়ন ও সাফল্যকে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসাবে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়, '...সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিটি দেশে তাদের বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে একমাত্র আর প্রধানত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম হবে না। না, তা হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত সকল উপনিবেশ ও দেশের, অধীনস্থ সকল রাজ্যের সংগ্রাম... প্রাচ্যের জাগরণের এই কালপর্বের পর সমকালীন বিপ্লবে আসবে আরেকটি কালপর্ব, যখন প্রাচ্যের সবগুলি জাতি অন্যের সমৃদ্ধির উপকরণমাত্র না হয়ে সারা দুনিয়ার ভাগ্যনির্ধারণে শরিক হবে। বাস্তব গ্রিয়াকলাপের, সারা মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণে প্রতিটি জাতির শরিকানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাচ্যে গগনজাগরণ দেখা দিয়েছে।**

* প্রাগদুস্ত, ১৯৬৫, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৫৪।

** প্রাগদুস্ত, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১৫৯, ১৬০।

সদুতরাং লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল 'সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সকল জাতীয় ও ঔপনিবেশিক মুক্তি-আন্দোলনগুলির ঘনিষ্ঠতম মৈত্রীবন্ধনের অন্তর্কূল একটি নীতি অনুসরণ...'*।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রাম এমন কি তখনো উদ্দেশ্যহীন নয়, যখন বিশ্বে একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিদ্যমান এবং উপনিবেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিপীড়িত। এমন কি তখনো যে সামাজিক শক্তিগুলির ও বিষয়গত উপাত্তসমূহের বিদ্যমানতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অবদান যোগায়, লেনিন তা দোঁখিয়েছেন। এগুলির মধ্যে তিনি মেহনতিদের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর গুরুত্বের উপর বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছেন। এই মৈত্রী কার্যত সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক আকাঙ্ক্ষারোধে নিজ সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে।

একইসঙ্গে লেনিন দেখান যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কতকগুলি বিষয়গত উপাত্তে মূলীভূত, যার প্রভাব পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থান ও সহযোগিতায় বাধ্য করে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যেকোন সরকার বা শ্রেণীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধান্তের চেয়ে অধিকতর প্রভাবশালী একটি শক্তি রয়েছে। ওই শক্তিটি হল বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা আমাদের সঙ্গে লেনদেনে তাদের বাধ্য করে।** একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী হিসাবে লেনিন তৎকালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 146.

** প্রাগদুস্ত, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৬।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে বর্জনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ‘কয়েকটি জাতি বা একটি জাতিপুঞ্জের বদলে বিশ্বদৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা না করলে কোন সমাধানই সম্ভবপর হবে না... পৃথিবীকে শেষ পর্যন্ত ওগুলির জন্য আমাদের কাছে আসতেই হবে, হোক তা আমাদের বলশেভিকবাদ কিংবা অ-বলশেভিকবাদ।’*

লেনিন ঐতিহাসিক বিকাশের এই বিষয়গত নিয়মটি সচেতনভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল শান্তির মজবুতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রবর্তন, যাতে আকৃষ্ট হবে মেহনতিদের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণীর একাংশও। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা বিশ্বঅর্থনীতির তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব দিই এবং তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এর শুদ্ধতা সন্দেহাতীত... রাশিয়া এখন এগিয়ে এসে বিশ্বসমক্ষে ঘোষণা করছে: আমরা বিশ্বঅর্থনীতি পুনর্গঠনে ইচ্ছুক — এই হল আমাদের পরিকল্পনা... আমাদের এই পরিকল্পনায় আমরা অবশ্য অবশ্যই কেবল সকল শ্রমিকের নয়, যুদ্ধান্তিষ্ঠ পুঁজিপতিদেরও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারব... আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি এবং দুনিয়াকে নির্মাণের একটি ইতিবাচক কর্মসূচির প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরা অর্থনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করছি, যে-সম্ভাবনাকে রাশিয়া অতীতের নিয়মরূপী পরদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের

* প্রাগদত্ত, খণ্ড ৪২, পৃঃ ১১৭, ১৭৮।

স্বার্থপর পরিকল্পনা হিসাবে দেখে না, দেখে সারা
দুনিয়ার স্বার্থে ওইসব অর্থনীতির পুনরুত্থানের পন্থা
হিসাবে।*

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন
ও উন্নয়নে কোন কোন পুঁজিবাদী চক্রের উৎসাহকে লেনিন
শান্তির সন্স্পর্শ নিশ্চয়ক হিসাবে দেখেছেন, কেননা, অর্থনৈতিক
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎসাহ শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক
রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের উৎসাহে পরিণত হয়।

তিনি বার বার পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের অসমসত্ত্বতা এবং
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতির বহুদুর্ভাগ্যতা ও
অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। অবশ্য তিনি গুরুত্ব সহকারে
উল্লেখ করেছেন যে, এই বহুদুর্ভাগ্যতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি
আপনা থেকে শক্তিশালী ও অধিকতর স্থায়ীত্বশীল শান্তির
অনুকূল কোন শর্ত সৃষ্টি করে না (বরং বিপরীতে, সেগুলি
পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণ হয়ে
উঠতে পারে)। সেগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে সফল
করে, যেহেতু সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার শান্তিপূর্ণ
বৈদেশিক নীতিতে, সেইসব পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির
কর্মনীতিকে মদত দিতে ব্যবহার করতে পারে, যেসব
পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ পরিস্থিতির জন্য সমাজতান্ত্রিক
রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষপাতী।

লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'সাম্রাজ্যবাদের যুগে সারা
দুনিয়া বিপুল সংখ্যক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং
ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ অসহায়, ধনী শক্তিগুলির তুলনায়

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 31, pp. 451-452.

অনুল্লেখ্য রাষ্ট্রগোষ্ঠী, যারা ক্ষুদ্র, দুর্বল রাষ্ট্রের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব করে।* লেনিনের মতে, সোভিয়েত রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনস্থ এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ছিল একটি প্রমাণ যে, ‘...বুর্জোয়ার সহানুভূতি ও সহায়তা পাওয়ার জন্য আমাদের পক্ষে বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। এখানে অতি জটিল একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের হারও বিভিন্ন এবং তা চলছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন উপায়ে ও পদ্ধতিতে। একটি দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সারা দুনিয়ার পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি থেকে ওগুলির বুর্জোয়াদের দোদুল্যমান করে তুলছে... বিচ্ছিন্ন ও আপাতদৃষ্টিতে অসহায় হয়ে পড়া দুর্বল প্রলেতারীয় প্রজাতন্ত্র এখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অধীনস্থ দেশগুলিকে তার পক্ষে টানতে সফল হতে শুরু করেছে — আর ওই দেশগুলিই তো ব্যাপক সংখ্যাগুরু... এটা (বিজয়) স্পষ্টতই দেখায় যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সংখ্যাগুরু মানুষের সম্পর্কে শান্তির স্বার্থকে তুলে ধরাছি... আমাদের নিজেদের জন্য নির্ধারিত মূল লক্ষ্য হল শোষকদের পরাজিত করা এবং দোদুল্যমানদের স্বপক্ষে আনা। কাজটি বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যের। এই দোদুল্যমানদের মধ্যে আছে অনেকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্র, যারা বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের ঘৃণা করলেও আবার অন্যদিকে নির্যাতিত বিধায় আমাদের সঙ্গে শান্তির পক্ষপাতী।’**

* প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩১৮।

** ঐ, পৃঃ ৩১৯, ৩২০।

শান্তির নীতি অনুসরণ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুতের জন্য লেনিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আরেকটি অন্তর্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যবহার সম্ভব ও প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি বার বার বলেছেন যে সকল পুঁজিবাদী সৈন্যবাহিনীর সংঘবদ্ধ হামলার মধ্যে প্রথম ও একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনেকটা সহজতর হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের সময় ও পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ভাঙ্গনের জন্য, যখন তারা যুদ্ধাশ্রম দ্বুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯১৮ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘...অক্টোবর বিপ্লবের এক বছর পর আমরা যে টিকেছিলাম তা কেবল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বুটি লুণ্ঠনকারী দলে বিভক্ত হওয়ার দরুন ...যারা মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল আর আমাদের দিকে নজর দেয়ার সময় পায় নি।’* যেকোন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় সোভিয়েত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল থাকার সেই সংকটকালে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত দ্বুটি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সংঘর্ষের দরুনই সে শ্বাস ফেলার কিছুটা অবকাশ পেয়েছিল।

দ্বুটি সাম্রাজ্যবাদী দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সদ্যব্যবহারের সময় তরুণ সোভিয়েত দেশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যকার সেই মহাহুতের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি বা সদ্যোগগুলির ব্যাপারে কখনই কোন ঝুঁকি নেয় নি। লেনিন এই ধরনের হীন-রাজনীতি সর্বদাই ঘৃণা করেছেন। তাঁর মতে, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে বিদ্যমান বিষয়গত, মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি অবশ্যই ব্যবহার করবে।

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 28, p. 154.

‘...শ্রমিক ও কৃষকদের সতিসতি যুদ্ধে টেনে নেওয়া অবশ্যই আমাদের জন্য অপরাধ হত। কিন্তু আমাদের যাবতীয় রাজনীতি ও প্রচারকার্য যুদ্ধাবসানের লক্ষ্যেই পরিচালিত এবং কোনক্রমেই জাতিসমূহকে যুদ্ধের দিকে চালিত করতে নয়... কিন্তু আমরা যদি... সাম্রাজ্যবাদী দস্যদের দ্বারা আক্রান্ত একটি দুর্বল সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবস্থানে রয়েছি, আমাদের বিরুদ্ধে জোট-বাঁধা কঠিনতর করে তোলার জন্য তাদের মধ্যকার বিরোধ ব্যবহার আমাদের জন্য নীতি হিসাবে কি সঠিক? অবশ্যই। এটাই সঠিক নীতি।’* কেবল ক্ষুদ্র নয়, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বর্জ্যোয়াদের মধ্যে এমন সব চক্র আছে, যারা কোন-না-কোন কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কে আগ্রহী, লেনিন তা লক্ষ্য করতে কখনই ভুল করেন নি। ‘...বর্জোয়া শিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, যারা যুদ্ধের সাহায্যে সমস্যা সমাধানে ইচ্ছুক, কিংবা যারা শান্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট, এমন কি নিকৃষ্টতম শান্তিবাদ, যা কমিউনিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্যতম বিবেচনারও অযোগ্য, সেক্ষেত্রে কাদের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করছি এই ব্যাপারে বাছাইয়ের সামান্যতম অবকাশও আমাদের নেই।’**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের যোগদানধন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত জেনোয়া সম্মেলনে উপস্থিত সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের অবস্থান প্রসঙ্গে লেনিন স্পষ্টভাবে ও গদ্যরুচ সহকারে বার বার বলেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়া জেনোয়ায় যাচ্ছে ‘...অন্য (বর্জোয়া)

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 470.

** প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ২৬৪।

শিবিরের শান্তিবাদী অংশের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টার জন্যই... জেনোয়ায় আমাদের অন্যতম প্রধান — যদি প্রধানতম না-ও হয় — রাজনৈতিক কাজ হল বর্জোয়া শিবিরের এই অংশটিকে বাছাই করতে হবে... জানাতে হবে যে তাদের সঙ্গে কেবল ব্যবসাই নয়, একটি রাজনৈতিক সমঝোতাও আমরা সম্ভব ও আকাঙ্ক্ষিত মনে করি...^{*}।

কূটনৈতিক পর্যায়ে দুই দুনিয়ার এই প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্য লেনিন বিপরীত সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল নীতিসমূহ ও সাংগঠনিক ধরনগুলির একটি বাস্তব কর্মসূচি বিশদ করেছিলেন।

জেনোয়া সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই সোভিয়েত প্রতিনিধিদল জোর দিয়ে বলেছিল যে ‘...পূর্বনো ও জায়মান নতুন সমাজব্যবস্থার সমান্তরাল অস্তিত্ব, মালিকানার দুই ব্যবস্থার প্রতিনিধিস্থানীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনাপ্রস্টা এই ঐতিহাসিক পর্যায় হল সার্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারেরই একটি অন্তর্ভুক্তি...’^{**} এই মধ্য বিবৃতিতে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিল যে তার দেশ নিজের তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য এই সম্মেলনে যোগ দেয় নি, দিয়েছে পারস্পরিকতা, সমানাধিকার এবং পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকল দেশের সরকার, বাণিজ্য ও শিল্প তরফগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

^{*} প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪০২-৪০৩।

^{**} Dokumenti vneshnei politiki SSSR (সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক রাজনীতির দলিলপত্র). — Moscow, Politizdat, 1961, Vol. 5, pp. 191-192.

ব্যাপকপারিসর অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচির প্রস্তাব উত্থাপনকারী এই সোভিয়েত প্রতিনিধিদল হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে ‘...ইউরোপ ও বিশ্ব এখনো নতুন যুদ্ধের, সম্ভবত সাম্প্রতিক বছরগুলির তুলনায় অধিকতর ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর যুদ্ধের বিদ্যমান হুমকির মুখে থাকার প্রেক্ষিতে বিশ্বঅর্থনীতি পুনরুদ্ধারের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে’*। সেই সময়ই সোভিয়েত প্রতিনিধিদল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আক্রমণ আর প্রতিবন্ধ সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুদ্ব্যদান সহ সার্বিক অশ্রুসজ্জা হ্রাসের একটি প্রস্তাব দিয়েছিল।

বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত সোভিয়েত গণ-কমিশার গেওর্গি চিচেরিন কর্তৃক প্রস্তুত এই জেনোয়া কর্মসূচিতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পথনির্দেশের জন্য একটি বিশ্বকংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল। ‘জবরদস্তুর উপাদান বা পিটুনি অভিযানের নিঃশেষ লুপ্তি এবং চুক্তিতে পেঁছানোর লক্ষ্যে আলোচনার একটি মণ্ড হিসাবে বিশ্বকংগ্রেসের উপর যাবতীয় নৈতিক দায়িত্ব অর্পণ একান্ত অপরিহার্য।’** সংখ্যালঘুদের অবদমনের বদলে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল বরং সকলের ঐকমত্য।

একটি নতুন উপাদান হিসাবে সোভিয়েত আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বিবেচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সমাধানে ইউরোপের জাতিগুলির সমান মর্যাদায় উপনিবেশের জাতিগুলির শরিকানা এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ রোধে শেষোক্তের অধিকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে

* প্রাগদুত্ত, পৃঃ ১৯৩।

** Lenin, V. I. *Collected Works*, 1976, Vol. 45, p. 509.

শ্রমিক সংগঠনগুলির বাধ্যতামূলক শরিকানার ব্যাপারটিও বিবেচিত হয়েছিল। চিচেরিন লিখেছিলেন যে, এই দুটি নতুন স্ব সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নির্যাতিত জাতি ও পদদলিত দেশগুলিকে রক্ষার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট নয়, কেননা, ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপরের স্তরের পক্ষে বিশ্বাসঘাতক শ্রমিকনেতাদের মতোই একইভাবে পদতুল হওয়া সম্ভব। এই দুটির অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথ তৈরি করে। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে অবশ্যই ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মন্ত্রণার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাজগুলি মোকাবিলা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা কংগ্রেসের দিক থেকে বিভিন্ন জাতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি প্রবর্তন সোভিয়েত কর্মসূচিতে বিবেচিত হয়েছিল। স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও দুর্বলকে বলিষ্ঠের অধীনস্থ না করেই শেষোক্ত কতৃক পূর্বোক্তকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করতে হবে... একইসঙ্গে অস্ত্রসজ্জার একটি সার্বিক হ্রাসেরও প্রস্তাব দেয়া হবে। বিশ্বকংগ্রেসের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসাবে বিশ্বপূনরুত্থানের বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ‘কর্মসূচিটি বলপ্রয়োগে বাস্তবায়িত হবে না। এটা হবে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রস্তাব এবং তা প্রত্যেকটি শরিকের সর্বাধিকার লক্ষ্যেই আবেদন জানাবে।’ সিদ্ধান্তে চিচেরিন লিখেছিলেন: ‘সবগুলি বিষয় থেকে একত্রে এই ছবি পাওয়া যায় যে, বুদ্ধিজীবী ব্যবস্থার আমলে তত্ত্বীয়ভাবে এটা সম্ভবপর, কিন্তু তা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জাতীয়

অহমিকা ও পুঁজিবাদী শ্বেবরতন্ত্রের লুপ্তনমূলক কার্যকলাপের
মুখোমুখি দাঁড়াবে।*

তৎকালীন পুঁজিবাদী নেতৃবৃন্দ এইসব প্রস্তাবের কী জবাব
দিয়োছিলেন? উত্তরটি ছিল: কর্মসূচিটি আলোচনায় সন্সপষ্ট,
শেষ ও দ্ব্যর্থহীন অস্বীকৃতি। পশ্চিমা শান্তিবর্গ আন্তর্জাতিক
জীবনে রাষ্ট্রসমূহ ও জাতিগণের সমানাধিকারের নীতিসমূহ
বাস্তবায়নের সোভিয়েত প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী প্রতিনিধিদের
অবস্থান ছিল অধিকতর ভণ্ডামিপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে
সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণের আহবান জানালেও তারা
সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে অ-
সামরিকভাবে পুঁজিবাদের আলিঙ্গনে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার
একক উপায় হিসাবেই কেবল দেখেছে। ১৯২০ সালে
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এ বিষয়ে পার্লামেন্টে
যথেষ্ট খোলাখুলিভাবে বলেছেন: ‘আমরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে
রাশিয়ার পুনর্গঠন ঠেকাতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি যে
ব্যবসার মাধ্যমে আমরা তা করতে ও রাশিয়াকে বাঁচাতে পারব।’

‘সমাজতন্ত্র থেকে রাশিয়াকে বাঁচান’ নীতিবাক্যটি ছিল
জেনোয়ার পশ্চিমের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির
অবর্তনশীল মর্মবস্তু। সম্মেলনে উপস্থাপিত সম্মিলিত
শান্তিবর্গের বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা
হয়েছিল যে নতুন সমাজব্যবস্থার মূলগত চরিত্রের ‘বিদ্যমান
পরিস্থিতির উল্লেখ্য পরিবর্তন ব্যতীত’ সোভিয়েত রাষ্ট্রের
সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি-বা অসম্ভব হবে। এমন ‘পরিবর্তনের’

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 45, p. 512.

অংশ হিসাবে আঁতাত দাবী করেছিল: জাতীয়কৃত বিদেশী মালিকানাধীন যাবতীয় সংস্থা ফেরত দেয়া, বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া ব্যবস্থা উৎখাত ও বিদেশীদের জন্য বিশেষ শাসনপ্রণালী, যা হবে ঔপনিবেশিক আত্মসমর্পণ ও এলাকাবহির্ভূতি থেকে আলাদা কিছুর নয়। সোভিয়েত সরকারের কাছে জারের কৃত ঋণশোধ দাবী করা ছাড়াও তারা রাশিয়ার ঋণ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের জেদ ধরেছিল। বিদ্যমান ঋণশোধের আর্থিক সংস্থান নির্ধারণ, এগুদলি সংগ্রহের ব্যবস্থা, অর্থাৎ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুদলির অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ওই কমিশনের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

‘বিদ্যমান পরিস্থিতির এইসব পরিবর্তন’ গ্রহণ ছিল রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথরোধের নামান্তরই শুধু নয়, অধিকন্তু সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক রাজ্যে তার অন্তর্ভুক্তিও।

১৯২২ সালের মে মাসে ‘নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্’ পত্রিকা পশ্চিমা শক্তিবর্গের সত্যিকার অবস্থান সম্পর্কে লিখেছিল, ‘...কেবল বলশেভিজমের পরই রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে কার্যকর সহযোগিতা শুরুর হতে পারে।’*

যথার্থই চিহ্নিত করছিলেন যে ‘জেনোয়া ছিল রাশিয়ায় শান্তিপূর্ণ পুঁজিতান্ত্রিক অনুপ্রবেশের তুঙ্গাবস্থা।’ তিনি বলেছিলেন যে প্রমিক-কৃষকের রাশিয়া ‘নিজের সীমান্তের, নিজের তীর ও তার প্রবেশপথ, সমুদ্রপথের এবং তার বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রাণপণ করছে। সেসব দেশের

* *The New York Times*, 28 May, 1922.

সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সে এর চেয়ে আরও তাৎপর্যশীল কিছ্‌। রাশিয়া হল বিশ্বশক্তির ত্রিস্রাপ্রতিক্রিয়ার একটি প্রধান উপাদান। একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী। আবার এইসঙ্গে সে বিশেষ লেনদেনের ভিত্তিতে আপসেও ইচ্ছুক। তার স্লেগান — লেনদেন চাই, দাসত্ব নয়।*

একথা মনে রেখেই জেনোয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সোভিয়েত দেশের সক্রিয় শরিকানা সহ ইউরোপে স্বাভাবিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুণি আপসপ্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবের সবগুণিই একটি মূলস্ফুটে গ্রথিত ছিল: সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা সংগঠনের সকল শরিককে বিজয়ের প্রতি বিজয়ীর উচ্চারিত কণ্ঠস্বরটি পরিত্যাগ করতে হবে। ১৯২২ সালের ১১ মে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল: 'একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর স্বার্থে রাশিয়া বিদেশী শক্তিগুণিকে গুরুত্বপূর্ণ সন্নিবেশদানে ভবিষ্যতেও প্রস্তুত, কিন্তু তা কেবল একটি শর্তে যে ওগুণি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে রাশিয়ার জনগণের অন্তর্কূলে সমান সন্নিবেশ আদায়ের সংশ্লিষ্ট হবে।**

লেনিন সমাজতান্ত্রিক ও পুঞ্জিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুণির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বীয় ভিত্তি বিশদ করেছিলেন এবং

* Chicherin G. V. Stat'i i rechi po voprosam mezhdunarodnoi politiki (আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কিত নিবন্ধ ও বক্তৃতা). — Moscow, Sotsekgiz, 1961, pp. 230-231.

** Dokumenti vneshnei politiki SSSR (সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক রাজনীতির দলিলপত্র), Vol. 5, p. 371.

সোভিয়েত সরকারের প্রধান হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা প্রবর্তনের জন্য অটলভাবে সংগ্রাম করেছেন। সেইসঙ্গে তৎকালের এই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল বিধায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কার্যকর করতে যে ব্যাপক অসুবিধার মুখোমুখি হবে, তিনি তাও জানতেন। বিপুল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সহ সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব এর বিরোধী ছিল। স্বাধীন অস্তিত্ব অটুট রাখার অধিকার লাভের পর এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি সারা দুনিয়ায় একা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। লেনিন তখন লিখেছিলেন: 'যা আমাদের শক্তি, স্বনির্ভরতা এবং যেকোন পুঁজিতান্ত্রিক লেনদেনে নিভাঁকি থাকার মতো আত্মবিশ্বাস দেবে তা পুরোপুরি অর্জন থেকে এখনো আমরা বহুদূরে...'*

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপ, তার যাবতীয় প্রস্তাব ও উদ্যোগ এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলির অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে শান্তির নিশ্চয়তা বিধান একাধারে একটি তত্ত্বীয় সম্ভাবনা তথা বাস্তব প্রয়োজন। এই তত্ত্বীয় সম্ভাবনার প্রায়োগিক বাস্তবায়নকে যে একটিমাত্র ঘটনা প্রহত করেছে তা হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনিচ্ছা। এই সত্যটি সর্বশেষ এই ঘটনায় প্রতিফলিত যে, শান্তি অব্যাহত রাখার খোদ প্রত্যয়টি তাদের কর্মনীতিতে সর্বদাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাঘাতের দাবীর সঙ্গে বিজড়িত থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আশায়

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 441.

বুর্জোয়া রাজনীতিকরা নিজেদের 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিনিময়ে ও পক্ষপাত সহ তারা এগুলি এমনভাবে গঠন করতে চেয়েছিল যাতে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। জার্মান সমরবাদের পুনর্জাগরণ এবং পূর্বাধিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার আক্রমণাত্মক অভীপ্সা লালনের মধ্যেই প্রবণতাটি সর্বাধিক সহজলক্ষ্য। ফলত, জার্মানিতে ক্ষমতা হিটলারপন্থী ফ্যাশিবাদের হস্তগত হয় এবং সকল রাষ্ট্র, দুনিয়াকে পদানত করার বাসনায় তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) বাধায়। বলাই বাহুল্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎখাতের আশায় যেসব দেশ নাৎসি নেতৃত্বকে মদত যুগিয়েছিল সেগুলিও তা থেকে বাদ পড়ে নি।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে অন্যদের নিরাপত্তার বিনিময়ে কোন বিশেষ রাষ্ট্রপুঞ্জ বা অঞ্চলগুলির শাস্তি ও নিরাপত্তা অটুট রাখার চেষ্টা পরিশেষে উল্টো ফলই ফলায় এবং এতে সকলের এবং এই সঙ্গে কখনো সবার আগে, যারা আত্মকেন্দ্রিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল তাদেরই নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। কেবল একা সোভিয়েত ইউনিয়নই কথার বদলে কার্যক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে আক্রমণকারীদের সাহায্যদান ও তাদের কুকর্ম আড়াল করার বিরোধিতা করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার কথা, অর্থাৎ দুনিয়ার অবিভাজ্যতার নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগের সপক্ষে লড়াই করেছিল। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নই ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামে (১৯৩৬-৩৯) তাকে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছিল। কেবল সে-ই চেকোস্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত

নাৎসি আগ্রাসন প্রতিরোধে নিজের পূর্ণপ্রস্থতির কথা জানিয়েছিল এবং ইউরোপের কলঙ্করূপী মিউনিক চুক্তি* ঠেকাতে চেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আর কেউ ইথিওপিয়ার যৌথ সাহায্যের কথা বলে নি এবং সে ফ্যাশিস্ট ইতালির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বর্জন অটলভাবে পালন করেছিল। জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনের সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফলপ্রসূ সাহায্য দিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ার অবিভাজ্যতার নীতিটি যুদ্ধগুণ্ডার অন্তর্বর্তীকালে সারা পৃথিবীতে প্রযুক্ত হওয়া এবং শোষণদের অধীনস্থ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুণ্ডার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক কর্মনীতি কার্যত এশিয়া ও আফ্রিকার নিরাপত্তার প্রশ্নটি উত্থাপন শুধু বাতিলই করে নি, ইউরোপের নিরাপত্তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া পড়েছিল। পশ্চিমের যাবতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও প্রস্তাবসমূহে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা এবং উপনিবেশগুণ্ডার ‘শান্তিপূর্ণ’ পুনর্বর্গীকরণের লক্ষ্য কোন-না-কোন মাত্রায় সংশ্লিষ্ট থাকত। স্বভাবতই, লেবেল-আঁটা নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুণ্ডার যৌথ-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের শরিকানা ছিল সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত।

সকল শোষণমূলক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুণ্ডা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীর সমর্থনপূর্ণ তার সৈন্যবাহিনীকে নিজ

* চেকোস্লভাকিয়া বিভাগ সম্পর্কে একদিকে রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ও অন্যদিকে হিটলারের জার্মানি ও ফ্যাশিস্ট ইতালির মধ্যে ১৯৩৮ সালে সম্পাদিত মিউনিক চুক্তি।

নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান, মৌলিক ও কখনো একমাত্র উপায় হিসাবে দেখে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবর্তিত নিরাপত্তার প্রত্যয়টি ছিল মূলগতভাবে পৃথক। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধির বিবৃতিটি উল্লেখ্য। এতে বলা হয়েছে: ‘সম্মেলন যে-সমস্যা মোকাবিলা করছে তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসাবে অভিব্যক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কাছে নিরাপত্তার প্রত্যয়টি উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের ধারণা থেকে আলাদা। নিরাপত্তা বলতে অনেকেই যা পরোক্ষে বোঝাতে চান তা হল— একটি আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধজয়ের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার নিশ্চয়তা লাভ। কিন্তু সোভিয়েত প্রতিনিধিদল খোদ যুদ্ধকেই অসম্ভব করে তোলার চেষ্টায় বিশ্বাসী, কেননা তা বিজয়ী ও বিজিত উভয় দেশের মেহনতিদের জন্যই কষ্টভোগ ডেকে আনে। তদুপরি তা সারা দুনিয়ার মেহনতিদের উপরও দুর্দশার বোঝা চাপায়।’*

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আত্মোপযোগী ও দূরদৃষ্টিহীন নীতির জন্যই এই প্রত্যয়টির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নি। এক্ষেত্রে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন অভিজ্ঞতাই নেতিবাচক। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অভিজ্ঞতাটি ইতিবাচকও বটে। কেননা, তা পশ্চিম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সোভিয়েতের শান্তি ও

* Dokumenti vneshnei politiki SSSR (সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক রাজনীতির দলিলপত্র). — Moscow, Politizdat, 1969, Vol. 15, p. 102.

নিরাপত্তা প্রস্তাবগুলি প্রযুক্ত হওয়ার অপরিহার্যতাকে প্রকাটিত করেছিল।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রয়োগ ছাড়া যে জাতিসমূহের নিরাপত্তা অটুট রাখা যায় না, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বটি ছিল তারই নাটকীয় প্রমাণ। এই কালপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া হুশিয়ারিটির সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল যে কয়েকটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের বিরোধিতার নীতি পরিশেষে যুদ্ধে পর্যবসিত হয় এবং সকল রাষ্ট্রের সমতার যৌথ ভিত্তিতেই সত্যিকার নিরাপত্তা অব্যাহত রাখা সম্ভব।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্ব সীমান্তগুলির অলঙ্ঘ্যতার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা এবং অন্য দেশে সশস্ত্র ও ‘শান্তিপূর্ণ’ উভয় ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করেছে।

সেই কালপর্ব এটাও সহজলক্ষ্য করে তুলেছিল যে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণের একটি নীতির অনুপস্থিতিতে আক্রমণ ও অ-বলপ্রয়োগের নীতিগুলির কোন দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ অসম্ভব। নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্য আক্রমণ অপরিণত থাকাকালেই তার বিরুদ্ধে দৃঢ় ও অটল প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। ‘কমিউনিজম থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচাও’ এই ধোঁকাবাজ স্লেগানের অন্তর্গত আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি এক্ষেত্রে সর্বিশেষ মারাত্মক বটে। আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রহত করার জন্য সকল রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকা প্রয়োজন। প্রতিশ্রুতি পালন করার ফাঁক খোঁজার চেষ্টা বস্তুত আক্রমণকারীকে মদত দেয়ারই নামান্তর।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিগর্ভী কীসে প্রযুক্ত হবে, বর্তমানে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। সমকালের অন্যতম মূল বিষয় শান্তি ও যুদ্ধের সমস্যা সমাধানে, সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক নীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগে লেনিনের অবদান আজো তার একটিও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। সোভিয়েত জনগণের কাছে ন্যায্য শান্তি ও শান্তিনীতির প্রত্যয় মহান নেতা ও শিক্ষক, কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ইতিহাসে লেনিনই প্রথম বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতি পরিচালনার সঙ্গে সমন্বিত করেন। লেনিনীয় তত্ত্বাবলী ও লেনিনীয় প্রয়োগগর্ভীর এই সমাবদ্ধ থেকে উৎপন্ন নীতি ও পদ্ধতি দ্বারাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগর্ভী আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচালিত হয়ে থাকে।

তিন। জাতিসংঘের সনদভুক্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বশক্তির ভারসাম্যের দ্রুত স্থানবদল সহ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধটি ছিল হিটলারের সমরযন্ত্রের চাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিপরীক্ষা। তদুপরি সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের টিকে থাকার সামর্থ্যও এতে পরীক্ষিত হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সসম্মানে এই নিষ্ঠুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং দেখিয়েছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের ইচ্ছা ছাড়াও তৎকালীন বৃহত্তম সামরিক শক্তির অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী হিটলারের জার্মানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা আর বিপ্লব রক্ষায়ও সমর্থ। রাজনীতি ও নৈতিকতার দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার আন্তর্জাতিক সম্মান ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিতকরণের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিশ্বের হিংস্রতম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সামরিক পরাজয় এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ার ফলশ্রুতি

অতঃপর বহু দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভবের ক্ষেত্রে অবদান যুগিয়েছিল। যুদ্ধকালে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিকাশের দৃঢ় সমর্থক হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি একটি নতুন, বলিষ্ঠতর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশেই নাৎসি ও জাপানী দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিশেষে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের উদ্ভব ঘটিয়েছিল এবং সেগুলি ব্যাপক গণসমর্থন সহ আমূল গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করেছিল। কয়েকটি দেশে এই সংস্কার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুগামী হিসাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ভিত, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফাটল ধরিয়েছিল এবং ফলত ঔপনিবেশিক দেশের জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধিতে অবদান যুগিয়েছিল।

ফ্যাশিস্ট সরকারগুলির সামরিক পরাজয় আসলে পুরো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার উপরই মূল আঘাত হিসাবে প্রকটিত হয়েছিল। কেননা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল তরফগুলি থেকে উৎসাহিত ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রগুলি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পুর্নজিতান্ত্রিক দেশগুলির বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে চালিত মূল হানাদার শক্তির প্রতীক। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আক্রমণ ও যুদ্ধের অনুসারী বৈশিষ্ট্যধর ফ্যাশিবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই একটি ঘনীভূত অভিব্যক্তি। তাই তার পরাজয় সাম্রাজ্যবাদকে শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই নয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবেও দুর্বল করে দিয়েছিল।

বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভারসাম্যের আসন্ন পরিবর্তনের ফল দাঁড়াল এই যে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সাধারণ নীতিগুলি বিশদীকরণ তথা এগুলির বাস্তব প্রয়োগের আনুষ্ঠানিক নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে সমমর্যাদায় সোভিয়েত ইউনিয়নের শরিকানাতে আর পরিহার করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফলত, সকল রাষ্ট্রের জন্য প্রামাণ্য আন্তর্জাতিক দলিলগুলি আলাপ-আলোচনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল, যে-নীতি সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রচার করে আসছিল সেই অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে।

এই দলিলগুলির মধ্যে প্রথমত ও প্রধানত উল্লেখ্য — জাতিসংঘের সনদ।

সনদটি বিশদ করেছিলেন নিজেদের সমাজব্যবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে যথাযথ অবহিত বিপরীত আর্থসামাজিক ব্যবস্থাধীন দেশগুলির প্রতিনিধিরা। বস্তুত জাতিসংঘের খোদ প্রতিষ্ঠার অর্থই ছিল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি তথা যুদ্ধরোধ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাব্যতা ও ফলপ্রসূতার সাক্ষ্য।

জাতিসংঘ সনদের খোদ প্রথম পঙ্ক্তিতেই ‘পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা’ সম্পর্কে সকল সদস্যের দৃঢ় ইচ্ছা এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ‘সহনশীলতা অভ্যাস ও সুপ্রতিবেশী হিসাবে শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস আর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অটুট রাখতে আমাদের শক্তি সংহত করার’ কথা ঘোষিত হয়েছে। একই গ্রহে বিভিন্ন

সমাজব্যবস্থানী দেশগগুলির বিদ্যমানতার বাস্তবতা 'একসঙ্গে বসবাস' এই বাক্যাংশেই প্রতিফলিত। 'সহনশীলতা অভ্যাস ও সুপ্রতিবেশী হিসাবে শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস' বলতে আসলে জনগণ কর্তৃক পছন্দ-করা সমাজব্যবস্থার প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ, নিজেদের বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা বদলানোর জন্য জাতি ও রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করার লক্ষ্যে বন্ধ বা চাপপ্রয়োগের অন্যান্য উপায় ব্যবহার প্রত্যাখ্যানই বোঝায়।

সনদের প্রথম দুটি ধারা, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার আলোচিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলির আনুবর্তিক মৌলিক সমস্যাবলী। প্রথম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য হল 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অটুট রাখা'। সংঘের অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যকে এই মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেবল বিশ্বশান্তি ও বিশ্বনিরাপত্তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জাতিসংঘের অন্যান্য সকল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্যভিত্তিক কতকগুলি নীতি তার সনদের দ্বিতীয় ধারায় স্থান পেয়েছে। এগুলিরই একটিতে বলা হয়েছে 'সকল সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক মতভেদগুলি শান্তিতে এমনভাবে মীমাংসা করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়' (অনুচ্ছেদ ৩, ধারা ২)। সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের যেকোন মতভেদ কেবল শান্তিপূর্ণভাবেই মীমাংসা করবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার যেকোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এড়ানোকে ন্যায়সঙ্গত করার 'পরম স্বার্থ' ইত্যাদি হিসাবে কোনকিছু এতে উল্লিখিত নেই। সনদ অনুসারে মতভেদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা শুধু

যুদ্ধই নয়, অন্যান্য ধরনের অবদমনও বাতিল করছে। 'শান্তিপূর্ণ ঘেরাও' বা সশস্ত্র প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগগুলি, যাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ বহুকাল থেকেই আন্তর্জাতিক মতভেদ মীমাংসার 'শান্তিপূর্ণ' উপায় বলে মনে করে আসছে, তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মতভেদগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নীতি জাতিসংঘের নিম্নোক্ত নীতিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, যাতে বলা হয়েছে: সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেকোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি বা বলপ্রয়োগ, জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের পক্ষে অসঙ্গত ধরনের অন্যতর কোন উপায় অবলম্বন থেকে বিরত থাকবে (অনুচ্ছেদ ৪, ধারা ২)। এই ধারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু বলপ্রয়োগই নয়, বলপ্রয়োগের হুমকিও নিষিদ্ধ করছে। তাই, জাতিসংঘ ও তার সদস্যরা একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের এমন কি হুমকি, অর্থাৎ সংঘাত প্রারম্ভিক পর্যায়ে থাকাকালে, তা রোধের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য রয়েছে। এভাবে সনদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চাপপ্রয়োগের প্রিয় উপায়গুলি — যেমন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জটিলতা ও মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংঘাতের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী সামরিক মহড়া আর অনুরূপ কার্যকলাপ — বাতিল করছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলির সঙ্গে পূর্ণমতৈক্য সহ জাতিসংঘের সনদ শর্তারোপ করে যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ছাড়াও সংস্থার অন্যতর উদ্দেশ্য: 'জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের

ভিত্তিতে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বসদৃশ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সর্বজনীন শান্তি মজবুত করার জন্য অন্যান্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ' (পরিচ্ছেদ ২, ধারা ১)। পরিচ্ছেদটি জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অটুট রাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তথা জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি এখানে সর্বজনীন শান্তি মজবুতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে উল্লিখিত। এই ব্যবস্থাবলীর অনুপস্থিতিতে শান্তি দৃঢ় করা যায় না।

জাতিসংঘের সনদ তাই রাষ্ট্রগুলির জন্য কেবল হুমকি বা বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকাই নয়, বন্ধুত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাক্রমে ব্যাপক পরিসরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটিয়েও যুদ্ধের সন্তাবনা দূর করা বাধ্যতামূলক করছে। কথান্তরে, জাতিসংঘের সনদ যা চায় তা হল 'অসি উঁচিয়ে সহাবস্থান' নয়, যেখানে খোলাখুলি যুদ্ধ না থাকলেও যেকোন সময় যুদ্ধ বাধ্য সম্ভব। সত্যিকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই এই সনদের কাম্য। 'বিভক্ত বিশ্ব', যেখানে নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থাধীন প্রতিটি রাষ্ট্রপুঞ্জ বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, যেন তারা ভিন্নতর সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলি থেকে গিরিচূড়ার ব্যবধানে পৃথকীকৃত — এমন ভিত্তি প্রার্থিত তথাকথিত 'সহাবস্থানের' ধারণাও সনদে স্বীকৃতি পায় না।

সনদের জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ক ধারাগুলির যেকোন মূল্যায়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবিত একটি সংশোধনী অবশ্যস্মর্তব্য। সে এই শর্তারোপ করেছিল যে এমন সম্পর্কগুলি 'জাতিসমূহের সমানাধিকারের নীতি ও

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি সম্মানের' ভিত্তিতেই বিকশিত হবে। এই নীতিতে নিজের পছন্দসই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাতিসমূহের অধিকারটি অন্তর্ভুক্ত আছে। এইভাবে সনদ রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের নির্বাচিত সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি উন্নয়নে, অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাবাদী দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি দ্বারা নিজ কার্যকলাপে পরিচালিত হতে অঙ্গীকারবদ্ধ করে।

২ নং ধারার ১ নং অনুচ্ছেদে প্রকটিত জাতিসংঘের অন্যতর প্রধান নীতিটি জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর বক্তব্য: 'সকল সদস্যের সার্বভৌম সমতার নীতির ভিত্তিতেই সংঘটি প্রতিষ্ঠিত'। জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমানাধিকারের নীতিকে তা আরও বেশি ন্যায়সঙ্গত ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে, কেননা এর শর্ত মোতাবেক কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল জাতি ও রাষ্ট্র তাদের আয়তন, জনসংখ্যা, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি নির্বিশেষে সকলেই নিজস্ব সমাজব্যবস্থা নির্বাচনের পরিপূর্ণ অধিকারী। জাতিসংঘের সনদে এই নীতির অন্তর্ভুক্তি এজন্যই আরও সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং এমনকি যুদ্ধের শেষ পর্যায়েও মার্কিন ও ব্রিটিশ নেতৃবর্গ এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনায় মেতেছিলেন যাতে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্ষুদ্র দেশগুলির 'অছি' হয়ে উঠে যেকোন জাতির জন্য পছন্দসই সমাজব্যবস্থা বাছাই করতে পারে। সেজন্যই ১৯৪৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে তাঁর মতে,

‘অন্তর্বর্তীকালে ছোটবড় অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে প্রথমাবস্থায় অছি হিসাবে থাকা ছাড়া আর বেশি কিছু করা’* সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের দেশগুলির জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা এই নেতৃবর্গ সবচেয়ে ‘উপযুক্ত’ ভাবে তাকে অবশ্য কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তৎকালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ অবশ্য সারা দুনিয়ার জাতিগুলির জন্য প্রতিষ্ঠিতব্য নিজেদের অভিপ্রেত অছিগিরির খুঁটিনাটি সম্পর্কে বলতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এইসব খুঁটিনাটি বিশদকরণে দায়িত্ব নাকি নানা ধরনের বেসরকারী সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তবে, সেগুলিতে ওইসব দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এগুলির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশন ছিল আধা-সরকারী বৃহত্তম সংস্থা। রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের জন্য কী ধরনের ‘সমানাধিকার’ ও ‘আত্মনিয়ন্ত্রণ’ অপেক্ষিত, যুদ্ধকালে সংস্থাটির প্রস্তুতকৃত দুটি প্রতিবেদনের মধ্যেই তার সন্দেহাতীত প্রমাণ ছিল। কমিশনের মূলসূত্র ছিল: যুদ্ধোত্তর দুনিয়া হবে হিংস্রতা ও অসাম্যের দুনিয়া। একটি প্রতিবেদনের বক্তব্য: ‘যুদ্ধশেষে বিশ্বপুনর্গঠনের দায়িত্ব পড়বে বিজয়ীদের উপর, তারা সেটা পছন্দ করুক বা না করুক, যেকেউ তা পছন্দ করুক বা না করুক... পুনর্গঠনের কাজের বেশির ভাগই পড়বে সম্ভবত ব্রিটেন ও মার্কিনীদের উপরই... তারাই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে যারা ক্ষমতা প্রয়োগের

* Churchill, Winston S. War Speeches 1940-1945.—
London, Cassel and Co. Ltd., 1946, pp. 213-214.

মতো যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে।*

প্রতিবেদন প্রণেতারা যে পুঁজিতন্ত্রের পতনরোধের জন্য একপ্রস্তাবাবস্থা বিবেচনা করেছিলেন তা ওই দলিলের অনেকগুলি উদ্ধৃতিতেই প্রকটিত। 'বিজয়ীদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। — লেখক) সামরিক শক্তির উপরই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সারা দুনিয়া অবশ্যই নির্ভরশীল থাকবে। প্রবাসী সরকারগুলির সৈন্যবাহিনী ও মুক্ত জাতিগুলির মধ্যে বিদ্যমান এমন সুপ্রতিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একযোগে তাদের সৈন্যবাহিনীগুলির উপর প্রায় সারা ইউরোপ এবং সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের শাসনের দায়িত্ব বর্তাবে যতদিন পর্যন্ত না নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ও জনগণ কী ধরনের শাসনপ্রণালী চায় সে সম্পর্কে মতপ্রকাশ না করছে... যেখানে প্রয়োজন সেখানেই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য এই শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে, এবং তারপর, স্থায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি সাময়িক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকবে।** যদিও কমিশন জাতিগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারদানের সংস্থান রেখেছিল, এই তথাকথিত 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' লক্ষ্য ছিল বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থপূজা।

শান্তি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশনের

* Commission to Study the Organization of Peace. Second Report. 'The Transitional Period.' N. Y., 1942, pp. 15, 17.

** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০, ১১।

প্রতিবেদনের অন্তর্গত সার্বভৌম সমতার নীতির ব্যাখ্যা ছিল স্পষ্টতই জাতিসংঘ সনদের বিরোধী। পছন্দসই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাতিগতদের অধিকারের যেকোন লঙ্ঘন, অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতিগতদের ‘অছি’ বা ‘অভিভাবক’ হিসাবে বৃহৎ শক্তিবর্গকে উপস্থাপনের যেকোন চেষ্টা বস্তুত মর্মগত ও আক্ষরিক অর্থে জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘনের সামিল।

সোভিয়েত উদ্যোগে সনদে সংযুক্ত সংশোধনী এই শর্তারোপ করেছিল যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি হবে জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিভিত্তিক, অর্থাৎ কেবল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র ও জাতিগতদের জন্যই নয়, ঔপনিবেশিক জাতিগতদের জন্যও। ধারাটি জাতিসংঘকে ঔপনিবেশিক সমস্যা ও ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে জাতিসমূহকে মুক্তিদানের আনুষ্ঠানিক প্রশ্নাবলী বিবেচনার যথাযোগ্য অধিকার দিয়েছিল। সোভিয়েত সংশোধনীর ফলে যে উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সুরূপ বিপন্ন হয়ে পড়বে, অর্থাৎই শেষোক্তদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাসভেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রাবল্যের দরুন জাতিসংঘের সনদ থেকে সংশোধনী ছেঁটে ফেলার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সনদে সোভিয়েত সংশোধনীদের অন্তর্ভুক্তি একাধারে মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির স্বীকৃতি বস্তুত জাতিসংঘের সনদে স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিক জাতিগুলির লড়াইকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও

আইনসঙ্গত স্বীকৃতিদানেরই সামিল। তদুপরি, ১ নং ধারার ২ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হল সর্বজনীন শান্তি মজবুতের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

ফলত, যেকোন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যার অসম্মাধান সর্বদাই আন্তর্জাতিক শান্তিকে প্রভাবিত করে আর আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা মোটেই ঔপনিবেশিক শক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসাবে বিবেচ্য নয়। পক্ষান্তরে, সনদের ব্যাখ্যায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কোনক্রমেই ঔপনিবেশিকতা ও তার ভেগদুলির অস্তিত্বকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেয় না। সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘ ও আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্র মর্জিত্যুদ্ধকে সমর্থনদানের পূর্ণ অধিকারী। জাতিসংঘের সনদের অর্থে এই সমর্থন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধী হিসাবে কখনই বিবেচ্য নয়।

জাতিসংঘের সনদের ১ নং ধারার ২ নং অনুচ্ছেদে এই সংশোধনী সংযোজনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখাতে চেয়েছিল যে সে অতীতের লজ্জাকর উত্তরাধিকার, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তার লড়াই পরিহারে মোটেই ইচ্ছুক নয়। সংশোধনীটি গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাদিক দেশগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গির আইনসিদ্ধতা এবং ভিন্নতর সমাজব্যবস্থায় দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির সঙ্গে এর সহবাসকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

উপরোক্ত নীতিগুলি ছাড়াও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বোঝার জন্য জাতিসংঘের সনদভুক্ত আরেকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ নীতি হল রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ। অনুচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অংশে আছে: ‘সনদে এমন কিছু নাই যা জাতিসংঘকে

কোন রাষ্ট্রের মূলগতভাবে অভ্যন্তরীণ এভিয়ারে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয় বা বর্তমান সনদের আওতায় মীমাংসার জন্য ওই বিষয়গুলি পেশ করতে সদস্যদের বলে' (অনুচ্ছেদ ৭, ধারা ২)।

জাতিসংঘ সনদে অধিষ্ঠিত অ-হস্তক্ষেপের নীতিকে ভিন্নতর সমাজব্যবস্থাদীন সহ সকল দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে হবে। নীতিটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওই রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা সম্ভবপর করে তোলে। জাতিসংঘ সনদের মতে অ-হস্তক্ষেপ নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যতিরেকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, অর্থাৎ জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভবপর নয়।

সনদের ১ নং ধারার ৩ নং অনুচ্ছেদের ঘোষণা মোতাবেক জাতিসংঘের লক্ষ্য: 'অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর মানবিক বৈশিষ্ট্যের আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানে এবং নরগোষ্ঠী, লিঙ্গ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবাধিকার ও সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ উন্নয়ন ও উদ্দীপনের পক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন।' ধারাটি এই মূলসূত্রে প্রোথিত যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক ক্ষেত্রগুলিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বস্তুত জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি অব্যাহত রাখার লক্ষ্য বাস্তবায়নের অনুকূল ধরনেই পরিচালিত হবে। ফলত, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার উপায়গুলি অবশ্যই এমন হবে যাতে তা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান যোগাতে পারে।

সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে নির্ভরযোগ্যতমভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘের সনদ প্রণেতারা নিরস্ত্রীকরণকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের অন্যতম প্রাথমিক উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছেন। ইতিমধ্যেই ১৯৪১ সালে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত আটলান্টিক সনদে অব্যাহত শান্তির পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থাবলী অপরিহার্য হিসাবে উল্লিখিত হয়েছিল। আটলান্টিক সনদের নীতিগতুলিতে যোগদান সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোষণায় জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের সৃষ্ট যাবতীয় বিপদ প্রতিরোধের মৌলিক সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্যও সংগ্রাম চালাচ্ছে। ১৯৪৩ সালের ৩০ অক্টোবরের সাধারণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত চার রাষ্ট্রের ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে যুদ্ধোত্তরকালে অস্ত্রসজ্জার বাস্তবানুগ পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণের একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে ও জাতিসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতা করবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতার সাধারণ নীতিগুলির মধ্যে জাতিসংঘ সনদের ১১নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদে 'নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা' উল্লিখিত হয়েছে। ২৬ নং ধারার একটি সূক্ষ্পষ্ট শর্ত বলে যে 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত অস্তিত্বের উন্নতিবিধানে' অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণের একটি প্রণালী বিবেচিত হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণকে জাতিসংঘের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলার সঙ্গে সঙ্গে সনদ কিন্তু তার নির্দিষ্ট ধরনগুলি ও পরিসর নির্ধারণ করে না। এগুলিকে সদস্য

রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আরও আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির বিষয় হিসাবেই দেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার ঘটনাবলী সর্বিশেষ মনে রেখে সনদের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অত্যন্ত ন্যায্য নীতি এই শর্তারোপ করে যে, সকল সদস্য 'সদস্যপদ থেকে ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাপ্ত অধিকার ও সুবিধাগুলি সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সনদ মোতাবেক তাদের গৃহীত দায়িত্বগুলি সরল বিশ্বাসে পালন করবে।' নিজেদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্ষা না করে কোন কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্য দেশ ও জাতির আইনসম্মত অধিকারের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যেকোন চেষ্টা ব্যর্থ করাই ছিল এই নীতির লক্ষ্য। জাতিসংঘ সনদের এটি ও অন্যান্য নীতিগুলি সকল রাষ্ট্র পদরোপদরি ও কঠোরভাবে মেনে চললে ন্যায্য, স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক শান্তি অর্জন সম্ভবপর হত।

চার। দাঁতাতের সপক্ষে, ‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ বিরুদ্ধে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের প্রত্যাশাটি আর পূর্ণ হয় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির, প্রথমত ও প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিটি তাঁদের জন্য সমাজতন্ত্র ও তার দৃষ্টান্ত ঘাঁটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ শুরুর সুযোগ এনেছে। এইসঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এমনকি উক্ত ‘ধর্মযুদ্ধের’ অত্যাচারী প্রবক্তারা এও জানতেন যে আক্রমণটি আশু বা সশস্ত্র হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে হিটলারী স্বেরাচার থেকে তাদের রক্ষক হিসাবে দেখত। পশ্চিমের শাসকচক্রগুলি আশা করেছিল যে তার ইতিহাসে কঠিনতম প্রবল রক্তক্ষরণের পর বিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশের কাছে নতিস্বীকারে, বিজয়ের ফলাফলগুলি ছেড়ে দিতে, সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সাম্রাজ্যবাদমুখী (বিশেষত মার্কিনী) মানের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে ‘খাপ খাওয়ান’ মেনে নিতে বাধ্য হবে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি বাছাই করা হয়েছিল :

— অস্ত্রপ্রতিযোগিতা শুরুর সামরিক ঘাঁটির দ্বারা সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি ঘেরাও, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক ব্লক গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর সামরিক উৎকর্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির অননুকূল নীতি। যেসব পারমাণবিক অস্ত্রের উপর ঘাঁটিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল একচেটিয়া অধিকার অটুট রাখতে পারবে বলে আশা করেছিল, সেগুলি এই কর্মনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদের পছন্দসই বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মনীতি চাপিয়ে দেয়ার হাতিয়ার হিসাবে আকাঙ্ক্ষিত সামরিক উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল;

— একদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নৈতিক ও রাজনৈতিক সম্মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে পশ্চিমে অস্ত্রপ্রতিযোগিতার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য ‘সোভিয়েত সামরিক হুমকির’ অতিকথাটির অবিরাম প্রচার ও তা অসম্ভব ফাঁপিয়ে তোলা।

ভিন্নতর সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ছিল উক্ত নীতিরই একটি অনুষঙ্গ। খোদ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটিই একটি ‘ধ্বংসাত্মক কমিউনিষ্ট স্লেগান’ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। যুদ্ধবাজ উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থার সংগঠক (১৯৪৯) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সত্যিকার কর্মনীতির ভিত্তি ছিল কেবল ‘কমিউনিজম রোধ’ নয়,

‘কমিউনিজমকে পিছ হটান,’ ‘পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তিদান’ ইত্যাদি তত্ত্বে প্রোথিত। ন্যাটো নেতৃবর্গ নিজ কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে ব্রিক্সম্যানশিপের প্রত্যয়কে ব্যবহাররূপে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও মজবুতের ধারণাটি কার্যত খোলাখুলিভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন। দুনিয়ার মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদ যা চাপিয়েছিল তা হল তথাকথিত ‘ঠান্ডা লড়াই’ — যা মানবতার অস্তিত্বকে দুই দশকাধিক কাল বিকৃত করে রেখেছিল এবং যার কুফলগুলি আজও দুর্লক্ষ্য নয়।

‘ঠান্ডা লড়াই’ ছিল দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতিরই একটি রকমফের। সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেবল নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরো চৌহদ্দিতেও এর প্রভাব ছিল নেতিবাচক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তার ও মজবুতি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি রোধের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা ‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ উদ্যোগ নিয়েছিল। এর দুটি নির্ধারক হেতু: প্রথমত, সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং কমিউনিস্ট ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ রোধে নিজ সামর্থ্য সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ত, এমন কি ‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ গোড়ার দিকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শ্রেণী ও রাষ্ট্র শক্তির বিদ্যমান পারস্পর্যের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া সশস্ত্র সংঘাত সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের অসামর্থ্য।

সাম্রাজ্যবাদ ভালই জানত যে একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ তার জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও

সে প্রায়ই সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ ছিল। যেমন: কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রথমে ফ্রান্স ও পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধগুলি, কিউবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার উদ্যোগ, মিশরে গ্রিশন্ত্রির সামরিক অভিযান, লেবানন ও নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, ইত্যাদি।

স্থানীয় সশস্ত্র সংঘর্ষের তুঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় দুনিয়াজোড়া সামরিক সংঘর্ষের আগুন জ্বালানোর প্রচণ্ড হুমকি দিয়েছে ও সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধাশঙ্কা বৃদ্ধির নীতিটি মূলত নিজেদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য নির্মাণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে যথেষ্ট অর্থলগ্নিতে বাধ্য করার লক্ষ্যেই পরিচালিত ছিল। এভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক বিকাশকে অবরুদ্ধ বা মারাত্মকভাবে প্রহত করতে চেয়েছিল। সামরিক উন্নয়ন উৎসাহ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মতানুসারী প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার এবং খোলাখুলিভাবে সোভিয়েতবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী পার্টি ও সংগঠনগুলিকেই শুধু 'সত্যিকার দেশপ্রেমিক' ঘোষণা করার প্রয়াস পেয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি প্রায় পুরোপুরি বাতিল করে দেয়াই ছিল 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কঠিন যুদ্ধোত্তর কালপর্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যেই তা পরিকল্পিত হয়েছিল এবং এভাবে মেহনতিদের কল্যাণমূলক উদ্যোগগুলি বন্ধ করে ও ফলত

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব কর্তৃক আরোপিত শর্তে তাদের কাছে সাহায্যভিক্ষায় নতজানু করতে চেয়েছিল।

‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ কালপর্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং পুঁজিতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভাবাদর্শগত সংগ্রামকে এক ‘মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে’ রূপান্তরিত করেছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও কর্মনীতির স্বেচ্ছাকৃত ও সার্বিক বিকৃতি সাধন সহ লাগামহীন একটি প্রচারকার্য পরিচালনার মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য প্রকটিত ছিল। ব্যাপক জনসাধারণের মনে এগুলি গাথার জন্য শক্তিশালী যাবতীয় গণমাধ্যম এই বিকৃতিগুলি নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় মেতেছিল। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির জন্য প্ররোচনা যোগান হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জন্য ‘মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ’ ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসর হস্তক্ষেপের নামান্তর। ‘মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ’ আসলে কোন ভাবাদর্শগত কলহ নয়। এটা ছিল জনমতকে কৌশলে ‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ কাজে লাগানোর একটি নীতি।

ব্রিঙ্গম্যানশিপের সাম্রাজ্যবাদী ধারণায় ‘ঠান্ডা লড়াইয়ের’ নীতিগুলি পূর্ণতা পেয়েছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ সারা দুনিয়াকে এক প্রবল উত্তেজনার চাপের মধ্যে রাখা তার লক্ষ্য ছিল, যাতে এমন কি অপেক্ষাকৃত সাধারণ সংঘাতেও দুনিয়াজোড়া পারমাণবিক যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার যথার্থ ও আশু আশঙ্কা বিদ্যমান থাকত।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক ও তাত্ত্বিকরা স্পষ্টতই সমাজতন্ত্রের প্রাণশক্তি ও সৃজনশীল সামর্থ্য এবং তার ধারণা

ও দৃষ্টান্তের আকর্ষণের যথাযথ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রক্রিয়াগুলির শক্তি ও তীব্রতার তাঁরা অবমূল্যায়ন করেছিলেন।

ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের প্রথম দিকে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে শক্তির নতুন ভারসাম্যের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের পক্ষে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সংগ্রামে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। শান্তি আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

সত্তরের দশকগুলি 'ঠান্ডা লড়াই' থেকে আন্তর্জাতিক দাঁতাত্তে উত্তরণের কালপর্ব হিসাবে সূচিহিত। বিশ্বশক্তিগুলির বিন্যাসের আমূল পরিবর্তনের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরো ব্যবস্থার তখন এক মৌলিক পুনর্গঠন সঞ্চারিত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকটিত উক্ত দিকবদলের অর্থ ছিল এই যে প্রগতিশীল শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের উপর নতুন ধরনের লড়াই আরোপ করেছিল আর সেগুলি কোন দ্বন্দ্বের সরল অবলম্বিতর বদলে তখনো লড়াই হিসাবেই বিদ্যমান ছিল।

দাঁতাত বা উত্তেজনা প্রশমন বলতে কমিউনিস্টরা কী বোঝে? দাঁতাত বলতে প্রথমত ও প্রধানত বোঝায় 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' অবসান ও রাষ্ট্রগুলির স্বাভাবিক স্থায়ী সম্পর্কে প্রত্যাবর্তন। এতে বোঝায় বলপ্রয়োগের বদলে, হুমকি ও অস্ত্রের কনৎকারের বদলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, সম্মেলনের টেবিলে বিরোধ-বিবাদগুলি মীমাংসার ঐকান্তিক ইচ্ছা। এতে

বোঝায় জাতিসমূহের মধ্যে আস্থা ও পরস্পরের ন্যায্য স্বার্থগুলি বিবেচনার আগ্রহ।

দাঁতাত কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। যারা একে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এতে আছে সংগ্রামের আহ্বান এবং যারা একে মানুষের স্বার্থানুকূল উপকারী প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ডাকা। এই সহযোগিতায় রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত ও ধর্মীয় পার্থক্যগুলি কোন বাধা হওয়া উচিত নয়।

দাঁতাত হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নামান্তর। কিন্তু একে বিশেষ বিদ্যমান অসংখ্য বিতর্কমূলক সমস্যার সবগুলির তাৎক্ষণিক ও শেষ সমাধান হিসাবে দেখা অবশ্যই ভুল হবে। দাঁতাত রাজনৈতিক পদবশর্ত ও মূলসূত্র সৃষ্টি করে, যা পরস্পরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে এসব বিষয়ের মীমাংসায় অবদান যোগায়। এই প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় করে তার ফলশ্রুতি হিসাবে 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' উত্তেজনায় প্রত্যাবর্তন রোধের উদ্যোগ গ্রহণ মানবজাতির কর্তব্য।

দাঁতাত একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। কেননা, দাঁতাতের বিকাশে বিজড়িত রয়েছে 'ঠান্ডা লড়াই' ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থেকে উৎপন্ন, এবং দাঁতাতের বিস্তার ও গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জায়মান, উভয় উৎসজাত অসংখ্য সমস্যার সমাধান। এই কালপর্বের স্থায়িত্ব দাঁতাত-বিরোধীদের প্রকাশ্য ও গোপন প্রতিরোধের মাত্রার এবং দাঁতাত-সমর্থক কোন কোন রাজনৈতিক শক্তির দিক থেকে অটলতার অভাবের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভৌগোলিকভাবে দাঁতাত একটি অবিভাজ্য প্রক্রিয়া। সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হওয়ার উপরই দাঁতাতের পূর্ণসাফল্য নির্ভরশীল।

দাঁতাত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক আবহের ও সর্বোপরি বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাদীন দেশ-গণ্ডার সম্পর্কের ইতিবাচক পরিবর্তনই শব্দ নয়, এইসঙ্গে পুরো একলহরী বাস্তব সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। এইসব সাফল্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রায়-সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি দেশগণ্ডার মধ্যে পরিচ্ছন্ন ও ন্যায্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়মের মান হিসাবে আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, যা সামরিক হঠকারিতায় উৎসাহীদের পথে আইনগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক বাধা সৃষ্টি করে। নিয়মগণ্ডা উল্লেখ্য সংখ্যক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বিবৃতি ও ঘোষণায় সূত্রবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এগণ্ডার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে ১৯৭৫ সালের ১ আগস্ট হেলসিংকিতে স্বাক্ষরিত ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের চূড়ান্ত সংবিধিতে। এই নীতিসমূহে বহু বছরের বাস্তব আন্তর্জাতিক সম্পর্কগণ্ডা সংকলিত হয়েছে এবং এগণ্ডা সারা ইউরোপীয় সম্মেলনের সকল শরিকের মতামত, স্বার্থ বিবেচনাক্রমে ও সাধারণ ঐক্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। সেজন্য এতে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতার অপরিহার্য ন্যূনতমটুকু, যা সকল রাষ্ট্র মেনে চললে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগণ্ডার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নির্বিঘ্ন হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ যে হেলসিংকিতে নিজের উপর নীতি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাগণ্ডালিকে তার সংবিধানের ২৯ নং ধারায় হেলসিংকি নীতিমালার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইনগত নমনায় রূপান্তরিত করেছে।

চূড়ান্ত সংবিধি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দশটি মূলনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

সার্বভৌম সমতার নীতি: পারস্পরিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীন এবং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সমান অধিকার ও বাধ্যবাধকতার শরিক। বৃহৎ আয়তন, সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে প্রবল শক্তিশালী নির্বিশেষে যেকোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর দাবী এই নীতি বাতিল করে। সার্বভৌম সমতার নীতি অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অবাধে বাছাই ও উন্নয়নের অধিকারের এবং এইসঙ্গে নিজের আইনকানুন অবলম্বনের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা সকল রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করে।

জাতিসমূহের সমানাধিকারের নীতি ও নিজেদের ভাগ্যান্বিতার অধিকারের নীতির সঙ্গে উপরোক্ত নীতিটি নির্বিড়ভাবে জড়িত। এই নীতি অনুসারে সকল জাতি বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনৈতিক অবস্থা নির্ধারণে, নিজেদের ইচ্ছামতো আপন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ অবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতার প্রথা, অন্য জাতি কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনে বাধাদানের উদ্দেশ্যে তাদের উপর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাপপ্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের প্রথা এই নীতির পরিপন্থী।

উপরোক্ত দুই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য

প্রয়োজন — অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ নীতি —
 কঠোরভাবে মান্য করা। এই নীতির বলে পারস্পরিক সম্পর্ক
 নির্বিশেষে রাষ্ট্রগুলি অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে
 প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, একক বা যৌথ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত
 থাকতে বাধ্য। শুধু সশস্ত্র হস্তক্ষেপই নয়, এই ধরনের হুমকি
 থেকেও তারা বিরত থাকবে। সন্ত্রাসবাদী, অন্তর্ঘাতী বা অন্য
 রাষ্ট্রের সরকারকে সবলে উৎখাতের লক্ষ্যমুখী অন্যতর
 কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের
 কাজ হিসাবেই বিবেচ্য। অ-হস্তক্ষেপের নীতি অনুসারে
 সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য যেকোন
 দমনমূলক ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকা সকল রাষ্ট্রের জন্য
 বাধ্যতামূলক।

প্রতিটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রসীমা দ্বারা
 পৃথকীকৃত এবং এই রাষ্ট্রসীমাগুলি রাষ্ট্রের এলাকাকে
 ঘিরে থাকে ও তার সার্বভৌম ক্ষমতার সীমানা নির্ধারণ করে।
 তদনুযায়ী, সীমান্তগুলির অলঙ্ঘ্যতার নীতি কঠোরভাবে মেনে
 চলার শর্তেই কেবল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক, সুপ্রতি-
 বেশীসুলভ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক সম্ভবপর হতে পারে। এই
 নীতি অনুসারে সকল রাষ্ট্র সকল সীমান্তকে অলঙ্ঘনীয় মনে
 করে এবং তারা এগুলির উপর কোন ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ,
 অর্থাৎ সীমান্তের মধ্য দিয়ে বেআইনী অনুপ্রবেশ ও আরেকটি
 রাষ্ট্রের কোন এলাকা বলপূর্বক দখল — এই উভয়টি থেকে
 অবশ্যই বিরত থাকবে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক
 অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে
 সীমান্তের অলঙ্ঘ্যতার নীতি আরেকটি রাষ্ট্রের কোন বিশেষ
 এলাকা বা পুরো অঞ্চলটি দখলের কার্যকলাপই শুধু

নয়, অভিন্ন লক্ষ্যসিদ্ধির কোন দাবী উত্থাপনও নিষিদ্ধ করে।
কথান্তরে, সীমান্তের অলঙ্ঘ্যতার নীতি অনুসারে অপর
দেশগুলির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক দাবি ও প্রতিশোধমূলক প্রচার
গ্রহণীয় নয়।

সীমান্তের অলঙ্ঘ্যতার নীতি রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক
অখণ্ডতার নীতির সঙ্গে সরাসর সংশ্লিষ্ট এবং তা যেকোন
রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে, তার রাজনৈতিক
স্বাধীনতা বা ঐক্যের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ পরিচালনা থেকে
বিরত থাকাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। এভাবে, কোন
রাষ্ট্রের একাংশ সবলে দখল করাই শৃঙ্খল নয়, কোন
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে বাহির থেকে সমর্থন বা উসকানি
দেয়াও নিষিদ্ধ। আঞ্চলিক অখণ্ডতার নীতি অনুসারে কোন
রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূখণ্ড দখলও নিষিদ্ধ, এমন কি
দখলকৃত এলাকা দখলদার রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত না
করা হলেও। কোন রাজ্য দখল বা সবলে অর্জন আইনসিদ্ধ নয়।

হুমকি বা বলপ্রয়োগের পারস্পরিক পরিহারের নীতি
হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই
নীতি অনুসারে রাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ও
সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য যেকোন
রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার
বিরুদ্ধে হুমকি বা বলপ্রয়োগ কিংবা জাতিসংঘের সনদের
পরিপন্থী অন্যতর কোন উপায় অবলম্বন থেকে বিরত থাকবে।
এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বলতে কেবল সশস্ত্র অবদমনই নয়, যেকোন
রাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক বা অন্য ধরনের চাপপ্রয়োগও বোঝায়।
হুমকি বা বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য
কোন বিবেচনা উচ্চাৰ্য নয়। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান

বিরোধ ও মতভেদ মীমাংসার জন্য উপায় হিসাবে হুঁমকি বা বলপ্রয়োগ প্রযুক্ত হবে না। স্বভাবতই একটি রাষ্ট্র কোন সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হলে সে নিজে বা মিত্রদের সঙ্গে একযোগে আক্রমণরোধে বলপ্রয়োগের পূর্ণ অধিকারী থাকে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার নীতি রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন না করে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তিতে শর্তবদ্ধ করে এবং তা হল বলপ্রয়োগ না করার নীতির একটি অনূসিদ্ধান্ত। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহ আলাপ-আলোচনা, তদন্ত, মধ্যস্থতা, আপস, সালিসি, বিচার-মীমাংসা বা নিজেদের পছন্দসই অন্যতর যেকোন শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে পারে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাপ্রধান দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আওতায় আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি মীমাংসার ক্ষেত্রে শরিকদের সমতা ও অক্ষত নিরাপত্তার ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাই হল সর্বাধিক ফলপ্রসূ। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোন একটি ধরন প্রয়োগ বিফল হওয়ার প্রেক্ষিতে শরিকদের কারও পক্ষেই তা বলপ্রয়োগের ওজুহাত হিসাবে ব্যবহার্য নয়। এক্ষেত্রেও তারা পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্য আরও অনূসন্ধান চালাতে বাধ্য।

মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতি বস্তুত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তাদের নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত বিধানিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এগুলির সামাজিক বিন্যাস, প্রকৃতি ও পরিসর আসলে প্রতিটি রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থার উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলত,

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সহযোগিতার কাঠামোর আওতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ উন্নয়নের যেকোন ব্যবস্থা অবশ্যই সার্বভৌম সমতা ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ নীতিসমূহের কঠোরতম প্রয়োগের নিরিখেই গ্রহণীয়।

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার নীতিটির সর্বক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগে উপরোক্ত সবগুণি নীতির কঠোর অনুবর্তিতা অপরিহার্য। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস, পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক আর আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার উন্নত করবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোর আওতায় রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশলগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক বিকাশের সুফলগুণি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাগুণি সরল বিশ্বাসে পালনের নীতির গুরুত্ব সমধিক। এই নীতিভঙ্গ আসলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার মূল ভিত্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উপরোক্ত দশটি নীতি দ্বারা গঠিত আইনগত ও রাজনৈতিক কাঠামোটিতেই বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কগুণি বিধৃত থাকতে পারে ও তা হওয়াই উচিত।

সন্দেহ নেই, দাঁতাতের আবহ স্থানগতভাবে (চাঁদ, মহাশূন্য, সাগর ও মহাসাগরের তলদেশের সামরিক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ), গুণগতভাবে (পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা এবং প্রতিবেশ রূপান্তর

কৃৎকৌশলের সামরিক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ) এবং পরিমণগতভাবে (পারমাণবিক অস্ত্রের অ-বৃদ্ধি, সোভিয়েত-মার্কিন স্ট্রাটégিক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি, জীবাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ) কয়েকটি ক্ষেত্রের অস্ত্রপ্রতিযোগিতা সীমিতকরণের কিছু চুক্তিসম্পাদনে অবদান রেখেছে। এই চুক্তিগুলি অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পারে নি। অবশ্য এগুলির অন্তর্পস্থিতিতে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা স্বরিত ও ব্যাপকতর হত।

দাঁতাত সেইসব সমস্যার সমাধান বা অন্তত সমাধানের দিকে একটি পদক্ষেপ সম্ভব করে তুলেছিল, যেসব সমস্যা 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' সময় কার্যকর আলাপ-আলোচনার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হত না কিংবা সমাধানের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। দাঁতাতের এই সুফলগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে জাতীয় সীমান্তের অলঙ্ঘ্যতার নীতি সংহতকারী অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও জাতিসংঘে প্রবেশ, পশ্চিম বার্লিন প্রশ্নের মীমাংসা।

এর অর্থ এই নয় যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক কর্মনীতির কোন আমূল পরিবর্তন হয়েছে বা হতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদাই ছিল তাদের কর্মনীতির উৎস। সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলন বৃদ্ধি, দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের গতিপথ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন, ইতিবাচক আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক কর্মনীতির শ্রেণীগত সারমর্ম প্রকাশের

নির্দিষ্ট রূপগর্ভিত প্রতীয়মান প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সত্তরের দশকের শেষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আবার মারাত্মকভাবে তীব্র আকার ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো-ভুক্ত তার मित्रদের সমরবাদী নীতি যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সত্তারের আকাশচুম্বী বৃদ্ধিসাধন, সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র — পারমাণবিক, রাসায়নিক, সাধারণ — উৎপাদনের বিশাল পরিকল্পনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা প্রসারের পরিকল্পনা করছে।

‘সোভিয়েত সামরিক হুমকির’ প্রথম থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ‘ধর্মযুদ্ধ’ ঘোষণা করেছিল। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের আদৌ স্থান নেই — এ ধারণা সে জনমনে দৃঢ়বদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের গতিমুখ উল্টোদিকে ঘুরোবার সাধ্য কারও নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজেদের নিয়ম মোতাবেক — সবচেয়ে প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার আইনানুযায়ী — বেঁচে থাকবে ও বিকাশ লাভ করবে।

পাঁচ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — বিষয়গত প্রয়োজন

১৯২১ সালে তৎকালীন দুনিয়ার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বাবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন উল্লেখ করেছিলেন: 'বিষয়গতভাবে — অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে — আমরা খুবই দুর্বল; কিন্তু নৈতিকভাবে — অবশ্য এতদ্বারা বিমূর্ত নৈতিকতা নয়, সকল দেশের সকল শ্রেণীর মূর্ত শক্তিগুণগুলির সমাবেশই বোঝাচ্ছি — আমরা সকলের চেয়ে শক্তিশালী।'* এটি কয়েক দশক আগের ঘটনা। নিজেদের নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি রক্ষা ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এক অতিসংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কালপর্বে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যা পূর্জিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের নির্ভরযোগ্য অবস্থান দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিজস্ব সামরিক শক্তির দৌলতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির যেকোন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং তাদের আক্রমণাত্মক অভীপ্সাকে যথেষ্ট সংযত রাখে।

একটি বিশ্বসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন থেকে প্রতীয়মান

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 151.

হয় যে লেনিনের নির্ধারিত লক্ষ্য, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সমগ্র বিশ্বরাজনীতিকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম একটি উপাত্তে পরিণত করা, অর্জিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের শক্তি যে স্থায়ী, ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তি নিশ্চিতকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণীর সামাজিক স্তরের বা পেশাগত দলসমূহের কোনই কয়েমী স্বার্থ নেই, অসুপ্রতিযোগিতার ফল থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ারও তাদের কোন আশা নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামনে যথেষ্ট জটিল সমস্যা রয়েছে এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের পথে সেগুলি সমাধান করা হচ্ছে। উক্ত সমস্যোগুলি সমাধানের পূর্বশর্ত হিসাবে আরেকটি যুদ্ধ রোধ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নিৰ্ভরযোগ্য ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমেই যুদ্ধাশঙ্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় শক্তিটি গঠিত। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই যে তা সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক বৈষয়িক শক্তিকে অভিন্ন বৈষয়িক অথচ শান্তিমুখী শক্তি দ্বারা মোকাবিলা করে। আর এটা এজন্যই কেন্দ্রীয় শক্তি, কেননা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের বিকাশ শান্তির অন্যান্য উপাদানগুলি মজবুত অবদান যোগায় ও সেগুলিকে অধিকতর কার্যকর করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের ফলেই বহু বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হয়েছিল এবং এই পতন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল শান্তিনীতির অনুসারী নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রবর্গ। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক

ও সামরিক অবস্থায় যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার কার্যকলাপের স্বাধীনতাও অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা উত্তরণের জন্য অপরিহার্য শান্তি অটুট রাখতে উৎসাহী উন্নয়নশীল দেশগুলি হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অটব রক্ষক। তাদের বৈদেশিক কর্মনীতি যে এই নীতির ভিত্তিতেই গঠিত তা উন্নয়নশীল দেশগুলির বহু সম্মেলন ও সমাবেশেই ঘোষিত হয়েছে। জাতিসংঘে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সংহত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রস্তাবসমূহে সর্বদাই নব্যস্বাধীন দেশগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের লুণ্ঠননীতির পথে বাধাস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সমানাধিকারসম্পন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই তাও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বাস্তবায়নের সংগ্রামে তাদের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে।

নিজেদের অগ্রদূত, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি বাস্তবায়নে অবদান যোজনকারী সত্যিকার একটি শক্তি গঠন করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে কমিউনিস্টরা তাদের কর্তব্য বিবেচনা করে থাকে। তারা সর্বদাই উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে রয়েছে এবং তা জনগণের অটলতম ও অত্যন্ত জরুরি দাবীগুলির অন্যতম।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির পক্ষসমর্থনে ব্যাপক জনসাধারণও শরিক হয়ে থাকে। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মানদুষ্ আর সামাজিক সংগঠন অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তারা সবাই মূলপ্রশ্ন — ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা

নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার অনুকূলে প্রবল উদ্যোগের প্রয়োজন বাস্তবায়নে — অভিন্নমত। এই ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' নীতির পুনরুজ্জীবন ব্যর্থ করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কমিউনিস্টরা সামাজিক দলগুলির বৃহত্তম পরিসরের প্রতিনিধিস্থানীয় সকল সংগঠনের সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তববাদী রাজনীতিকদের সঙ্গে, এবং সকল গণতান্ত্রিক পার্টি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আগ্রহ দেখায়।

বিশ্বশক্তিগুলির বিন্যাসের সার্বিক পরিবর্তনের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতির উপর শ্রমিক শ্রেণী ও প্রগতিশীল মানুষের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবন্ধনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী এখন শাসকচক্রগুলিকে নতুন বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ, স্থানীয় যুদ্ধ বাধানোর নীতি পরিত্যাগ এবং অর্থনীতিকে শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বাধ্য করাতে পারে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়গত বিদ্যমান চাহিদা হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি হেতু। সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক চুক্তিগুলি কেবল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিরই নয়, রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানেও ফলপ্রসূ অবদান যোগানোর উপায় হতে পারে। অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের শক্তি ও সংহতি আরও মজবুত হয়ে উঠছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে

সহযোগিতার ফলে প্রগতিশীল ধারায় ওইসব দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-জীবন পুনর্গঠন সহজতর হচ্ছে। পরিশেষে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত চুক্তিগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বৈষয়িক ভিত্তিকে মজবুত ও প্রশস্ততর করে তুলছে।

দুনিয়ার মানুষ বৈশ্বিক সমস্যাবলীর মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেগুলি ক্রমেই তীব্রতর, জটিলতর হয়ে উঠছে। এগুলি হল জ্বালানি সংকট, প্রতিবেশ সংরক্ষণ, বহুব্যাপ্ত বদভুক্ষা ও মারাত্মক ব্যাধি উৎখাত, বিশ্বসমুদ্রের সম্পদ আহরণ, ইত্যাদি। এসব সমস্যার সমাধান একক রাষ্ট্র বা একটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধ্যায়ত্ত নয়। এজন্য ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর বাইরে থেকে সমগ্র মানবজাতি যেসব ভবিষ্যৎ সমস্যার সম্মুখীন সেগুলির মোকাবিলা বা বর্তমানকালের অনেকগুলি অত্যন্ত জরুরি চাহিদার সফল সম্পূরণ — কোনটাই সম্ভবপর নয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলি আধুনিক অস্ত্রসজ্জার আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সক্ষম হলে তা যে পারমাণবিক যুদ্ধের আকার নেবে তাতে সন্দেহ নেই। এই যুদ্ধে একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ স্বার্থ বা অবস্থানই শূন্য বিপদাপন্ন হবে না, খোদ মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিপদটি যুদ্ধকালে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্রের বিপুল ধ্বংসাত্মক শক্তির ফলই শূন্য নয়, এতে আরও আছে মানুষের বংশাণুগত কাঠাম ও প্রতিবেশের উপর ব্যাপক পারমাণবিক আঘাত ও তাতে পরবর্তীকালীন পারমাণবিক বিকিরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া।

সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নের আরেকটি ফলও বিবেচ্য: আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্র প্রবর্তন এবং পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত বিমানবাহিনী, নৌ ও সাবমেরিন বহর গড়ে তোলার ফলে সাম্রাজ্যবাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই মহাসমুদ্রের দুর্ভেদ্য থেকেও আজ আর নিজে সুরক্ষিত মনে করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমত ও বাস্তববাদী রাজনীতিক — উভয়ই এখন উপলব্ধি করতে পারে যে দুনিয়াজোড়া পারমাণবিক যুদ্ধের আগুনে শুধু মার্কিন সশস্ত্র শক্তিই নয়, তার অর্থনীতি, শিল্পসামর্থ্য, প্রকৃতি এবং মানবসম্পদ ধ্বংসের মূখ্যমুখি হবে।

আগেকার যুগগুলিতে যুদ্ধরত প্রত্যেকটি শরিকই অপরকে হারিয়ে যুদ্ধে জয়লাভের কথা ভাবত এবং একটি দেশ তা অর্জন করত। সেজন্য যুদ্ধের পক্ষে রাজনীতির সম্প্রসারণ সম্ভবপর ছিল। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের আগুনে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংসের সমুদ্র সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এমন যুদ্ধে কোন বিজয়ীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদরোধে বিষয়গতভাবে সকল রাষ্ট্রেরই স্বার্থ রয়েছে। এটা পশ্চিমের অনেক রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতার উপর সংঘমী প্রভাব ফেলেছে, যাঁরা আজকের সত্যিকার দুনিয়া সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো সাহস রাখেন। 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' বেশ কয়েকজন প্রচারক ও প্ররোচক ক্রমেই নিশ্চিত হয়েছে যে বলপ্রয়োগ বা হুমকির জোরে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিবিপ্লব ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের আশা এখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। মানবসমাজের বিকাশের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ কিছুমাত্র পরিত্যাগ না করে বুদ্ধিজীবীদের এই অংশটির

প্রতিনিধিরা নিজেদের লড়াইয়ের ধরন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সত্যিকার বাস্তবতা তাদের স্পষ্টতই দেখিয়েছে যে, এমন কি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও, দাঁতাত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিন্নতর কোন যুক্তিসঙ্গত বিকল্প নেই।

উপরোক্ত সমস্ত কারণ রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি সৃষ্টি করলেও সেগুলি মোটেই স্বয়ংক্রিয় নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এবং বিদ্যমান ও জায়মান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে প্রভাব বাস্তব হতে হলে নিজ নিজ দেশের অবস্থান নির্ধারক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ ও রাষ্ট্রশাসকদের পক্ষে সমাজবিকাশের নিয়মানুযায়ী তাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনা প্রয়োজন।

আজকের জটিল দুনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করতে, জাতিসমূহের নিরাপত্তা সংহত করতে ও ব্যাপক পরিসর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটাতে হলে সকল দেশ ও সকল জাতির সঙ্গে শান্তিতে ও সুপ্রতিবেশী হিসাবে বসবাসের ইচ্ছাই শূদ্ধ যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাবনা ও মূল প্রবণতাগুলির বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতির ব্যবস্থাপনা, যা সর্বজনীন শান্তি অব্যাহত রাখতে, সমানাধিকারসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধানসমূহের উদ্দেশ্যপূর্ণ, সময়োচিত ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেবে।

যুদ্ধরোধ এবং একটি ন্যায্য, গণতান্ত্রিক শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সকল যুদ্ধবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের কর্মসূচি তৈরি করেছে।

আঞ্চলিক কমিউনিস্ট সভাসমিতিতে সম্প্রসারিত প্রায়োগিক কার্যকলাপের কর্মসূচিগদূলি খুবই বিশদ ধরনের। এক্ষেত্রে ইউরোপের দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭ সালে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগদূলি চেকোস্লভাকিয়ার কার্লভি ভারি শহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে ইউরোপের নিরাপত্তার একটি কর্মসূচির প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই কর্মসূচিতে ছিল: ইউরোপের আজকের সীমানাগদূলি অলঙ্ঘনের স্বীকৃতি, দুটি সার্বভৌম ও সমানাধিকারী জার্মান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, ১৯৩৮ সালের নিউনিক চুক্তি বাতিল, একটি সারা-ইউরোপীয় সম্মেলন আহ্বান, ইত্যাদি। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কর্মসূচির মূল বিষয়গদূলি বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং তা ছিল কার্লভি ভারি কর্মসূচির অন্তর্লীন বর্তমান পরিস্থিতির কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণে উত্তীর্ণ মূল সিদ্ধান্তগদূলির শুদ্ধতা এবং এর অন্তর্গত সংগ্রামের অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের অভ্রান্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

নির্ধারিত লক্ষ্যগদূলি অর্জন কার্যত ইউরোপীয় মহাদেশে ইতিবাচক পরিবর্তনগদূলির গভীরতা সাধনকে সম্ভব ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল এবং কমিউনিস্টদের সামনে ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা মজবুতের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন লক্ষ্যাবলী নির্ধারণের কর্তব্য উপস্থিত করেছিল। কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৭৬ সালে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগদূলির বার্লিন সম্মেলনে। কমিউনিস্টরা সেখানে ইউরোপে শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সমাজপ্রগতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের অভিমত সূত্রবদ্ধ করেছিল।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিগদূলির বিশদীকরণ ও বাস্তবায়ন

বস্তুত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের দরুন প্রয়োজনীয় জরুরি কর্তব্য সমন্বয়ে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের কার্যকর সম্মেলন আহ্বানকে মোটেই বাতিল করে না। বরং পূর্বোক্ত শেষোক্তেরই ইঙ্গিতবহ।

যুদ্ধরোধ ও ফলত তা নিশ্চিত করার শর্তগুণি প্রতিষ্ঠায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের উদ্যোগ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কৃত কর্তব্যগুণি সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। শাসকদল হিসাবে তারা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাবান দেশগুণির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখে ও রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সহ যাবতীয় কর্মনীতি নির্ধারণ করে।

এই সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হিসাবে ওয়ারশ চুক্তিসংস্থার রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির নিয়মিত অধিবেশন — যেখানে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুণির নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন — উল্লেখ্য। রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির দলিলগুণিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ের নির্দিষ্ট পরিবেশ বিবেচনাক্রমে সবচেয়ে জরুরি আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে এবং সেগুণি সমাধানের পথ ও উপায় নির্ধারণে ওয়ারশ চুক্তিসংস্থার সদস্যদের অবস্থান প্রতিফলিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুণির সমন্বিত বৈদেশিক নীতি ফলপ্রসূ, কেননা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসারে তাতে আছে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের সত্যিকার জাতীয় স্বার্থের অনুকূল সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব ব্যবস্থাবলী।

কমিউনিস্ট লক্ষ্যগুণি অর্জনে এবং মূলত যুদ্ধরোধে কমিউনিস্ট উদ্যোগগুণির সাফল্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুণির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুণি কর্তৃক বিশদীকৃত বৈদেশিক কর্মনীতির কর্মসূচির আধেয়ের উপর প্রথমত ও প্রধানত

এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের অধ্যবসায় ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এই সবই সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর বিপুল ঐতিহাসিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করে এবং এইসঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাঠামোর তাদের কোনই বাড়তি অধিকার দেয় না।

কয়েকটি প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা মীমাংসায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ আবহে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৭১ সালে অনর্দষ্টত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তিকর্মসূচির অটল বাস্তবায়ন চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী কংগ্রেসগুলি ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলি শান্তিকর্মসূচির বিকাশ অব্যাহত রেখেছে। শান্তিকর্মসূচি সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির অন্তর্লীন স্থায়ী নীতিভিত্তিক, যে-নীতি অনুসারে আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যাবর্তের সঙ্গে অবশ্যই থাকবে একটি সৃজনশীল কর্মনীতি আর এই কর্মনীতির লক্ষ্য: জরুরি আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাপন দেশগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক, বা অবস্থা অনুকূল হলে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখা। শান্তিকর্মসূচির প্রধান বার্তা হল: আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি উন্নয়নে 'ঠান্ডা লড়াই' থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রত্যাবর্তন অবশ্যই নিঃসন্দেহ হবে বিশ্বসমাজতন্ত্রের শক্তি, বাঁধুনি ও উদ্যোগী কার্যকলাপ এবং শান্তি ও প্রগতির যাবতীয় শক্তির সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের মাধ্যমে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যে তার কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংহত করার এবং যুদ্ধের বিপদ থেকে

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সরে আসার মূল বাস্তব কর্তব্যগুণ নিৰ্ধারণ করতে পেরেছিল, তার গুরুত্ব সমাধিক। কর্মসূচিটি যে সময়োচিত ও বাস্তবধর্মী ছিল — ঘটনাবলীর বিকাশে তা সমর্থিত হয়েছে।

লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মতাবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে যুদ্ধ ও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাবাদী দেশগুলির মধ্যে সরাসর সংঘাত প্রত্যাহার থেকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও আস্থার একটি মাত্র অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আস্থা আপনা থেকে, কেবল কথা ও আস্থাসের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না। এজন্য আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সমাধানের সুনির্দিষ্ট ও সৃজনশীল উদ্যোগ অপরিহার্য। একটি সমস্যার সমাধানে আস্থা বৃদ্ধি পায় ও অন্যগুলি, জটিলতর সমস্যোগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয় শর্ত সৃষ্টি করে, যা আবার আস্থা ও পারস্পরিক সমঝোতার উন্নতি ঘটায়। শেষোক্তের উন্নতির জন্যও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন কোন নীতির কঠোর অন্তর্ভুক্তি অত্যাৱশ্যকীয়।

বিপরীতে, কর্তৃত্বের অবস্থান থেকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা, আলাপ-আলোচনায় নিজের শরিকের উপর চাপপ্রয়োগ ও একতরফা সুবিধা আদায়, স্বীকৃত নীতি বা অর্জিত সমঝোতা থেকে কোন ব্যত্যয় — সবই পারস্পরিক সমঝোতা ও আস্থার প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর এবং সেজন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে অগ্রগতির বাধাস্বরূপ।

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সমাধানে রাষ্ট্রসমূহের ন্যায্য স্বার্থের প্রতি বিবেচনা দেখানোর মনোভাব যে শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থানের একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ, তা অনস্বীকার্য। এই মনোভাবের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায্য সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

বিশ্বের যেকোন অঞ্চলকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'পরম স্বার্থের' এলাকারূপে ঘোষণা করেছে এবং সশস্ত্র সহ যেকোন উপায়ে সে 'স্বার্থ' রক্ষা করার দাবি জানাচ্ছে তা একেবারেই যুক্তিহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় আরও খোলাখুলিভাবে বিশ্বে তার নেতৃত্বমিকার দাবি জানাচ্ছে। উপরন্তু, মার্কিন প্রশাসনের যেসব বিবৃতিতে অভূতপূর্ব অসুপ্রতিযোগিতার কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে তা-ই প্রমাণ দিচ্ছে যে এই উদ্দেশ্যসাধনের মূল পন্থারূপে তারা দেখছে সামরিক শক্তির বিপুল সম্প্রসারণ, সামরিক শ্রেষ্ঠতা অর্জনের কাজকে। হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন জনিত রাজনীতির এক বিশেষ যন্ত্র গড়ে তুলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: তথাকথিত দ্রুত মোতায়েনক্ষম বাহিনী, অর্থাৎ নিজ আন্তর্জাতিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে এক স্থায়ী উপাদানে পরিণত করার অভিপ্রায়। কয়েক দশক আগেকার মতো ওয়াশিংটন আবার 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' ভাষায় বলতে চেষ্টা করেছে, চরম প্রস্তাব দিচ্ছে, অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টি করেছে, রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপ শুরুর করেছে।

কল্পিত যেকোন ধরনের বাহানা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে তার সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের কাজে সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে নগ্ন হস্তক্ষেপের জন্য, ওয়াশিংটনের কর্তৃক অমান্যকারী যেকোন দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকান অস্বব্যবহারের জন্য সে ঘাঁটি গড়ে তুলছে। ফলে বিশ্বের যেকোন অঞ্চলে —

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য আমেরিকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে মধ্য অবস্থান নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতির প্রতি বিশ্বাসী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি রক্ষা ও স্থায়ী করা, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও গভীরতাসাধনের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

কমিউনিস্টরা মনে করে যে দাঁতাত বস্তুত রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কে বিদ্যমান খাবতীয় উত্তেজনা হ্রাস ও পরিশেষে তা সর্বৈব লুপ্তিরই নামান্তর। এভাবে দাঁতাত হল এমন একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া, যা ভাবাদর্শগত লড়াইয়ের বলয় বা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক রূপান্তর কিংবা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বিজড়িত করে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কোনক্রমেই শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মগুলি বাতিল করে না, বাতিল করতে বা বদলাতে পারে না। দাঁতাতের বলে কমিউনিস্টরা পুঞ্জিতান্ত্রিক শোষণকে স্বীকৃতি দেবে বা একচেটিয়ায় বিপ্লবে মদত যোগাবে, এমন ভাবনা একান্তই অবাস্তব। দাঁতাতের একটি অপরিহার্য শর্ত হল অন্যদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপ নীতির কঠোর অনুবর্তিতা এবং তাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

ভাবাদর্শগত বিরোধিতাকে যারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সঙ্গে জড়াতে চেয়েছে, তা থেকে তাদের বিন্দুমাত্রও লাভ হয় নি। ভাবাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

রূপান্তরিত করলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তার পরিণাম হবে অতিশয় ভয়ঙ্কর।

সামাজিক বিকাশ (ভাবাদর্শগত সংগ্রাম সহ) হল ঐতিহাসিক বিকাশেরই একটি বিষয়গত ও অপরিহার্য দিক এবং এই শেষোক্ত বিকাশ কোন সরকারের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা কার্যকলাপ থেকে নয়, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার খোদ অস্তিত্ব থেকেই উদ্ভূত।

শ্রেণী-সংগ্রামের ধরন হিসাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের লাগান যুদ্ধগুলিতে এক ধরনের সমাজব্যবস্থাধীন দেশ কর্তৃক অন্য ধরনের সমাজব্যবস্থাধীন দেশের বিরুদ্ধে সরাসর সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অন্তপ্রতিযোগিতা, স্থানীয় সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে দু'নিয়াজোড়া সশস্ত্র শক্তিপরীক্ষার চরম সীমায় পৌঁছানোর অনুঘটক সহ 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' সময় শ্রেণী-সংগ্রামও পুঁজিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শক্তিপরীক্ষার বা ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি ধরনের রূপলাভ করে। পুরোপুরি ও খোলাখুলিভাবে সশস্ত্র শক্তি ব্যবহৃত না হলেও শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফলের নির্ধারক একটি হেতু হিসাবে তা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তদুপরি 'ঠান্ডা লড়াইয়ের' সময় এমন মূহুর্ত্তও আসে যখন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্যকার পার্থক্যটুকু পলকা ও নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিংস্রতা ও প্রকাশ্য বা গোপন চাপপ্রয়োগ লোপ বোঝায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের

আওতায় সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন মদুখোমদুখি সংঘর্ষে বিজড়িত হবে না।

দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ ধরনগুলির অস্তিত্ব কোনক্রমেই তার শ্রেণীগত মর্মবস্তু থেকে খর্বিত হওয়া নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতির শ্রেণীগত মর্মবস্তুটি আসলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের খোদ উপলব্ধিতেই নিহিত। এই উপলব্ধির ভিত্তি হল বাহিরের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজ দেশের সমাজব্যবস্থা বদলানোর অধিকার সহ অবাধে নিজ ভাগ্যনির্ধারণে জনগণের অত্যাঙ্গা অধিকারের স্বীকৃতি। তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আওতায় বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবিপ্লব উভয়টি রপ্তানিই অস্বীকৃত।

কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রচারিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপলব্ধিতেও বৈদেশিক নির্ভরতার সবগুলি ধরন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, ঔপনিবেশিকতা বিলোপ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের অসম্মতি নিহিত রয়েছে।

সমাজ যতক্ষণ বৈরী শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিভক্ত থাকবে, ভাবাদর্শগত সংগ্রাম সহ এদের মধ্যকার সংগ্রাম ততক্ষণ একটি বিষয়গত বাস্তবতা হয়ে থাকবে, যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তিগুলির দ্বারা বিলোপ বা বেআইনী করা যাবে না। সেজন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের খোদ প্রত্যয় এবং তার বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থাগুলি ভাবাদর্শগত সংগ্রামের বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কগুলি এমনভাবে অব্যাহত রাখা উচিত যাতে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের বিকাশ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের, অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপের, কোন কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বাধান 'মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রামের' রূপলাভ না করে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতি যে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তিসংগ্রামে অবদান যোগায়, দৃষ্টান্ত হিসাবে, তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছিল ১৯৭৬ সালের ইউরোপের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির বার্লিন সম্মেলনে: '...শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতি, সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের মধ্যকার সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক দাঁতাত বন্ধুত্ব প্রতিটি জাতির স্বার্থ তথা সমগ্র মানবজাতির প্রগতির লক্ষ্য — এই উভয়ের সঙ্গেই মানানসই, এবং কোনভাবেই বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিবস্থা অব্যাহত রাখা বোঝায় না, বরং বিপরীতে, শ্রমিক শ্রেণী ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রামের বিকাশ সাধনের জন্য, অবাধে নিজের উন্নয়নের পথ বাছাই ও তা অনুসরণে প্রত্যেকটি জাতির অত্যাঙ্গ অধিকার বাস্তবায়নের জন্য, একচেটিয়াদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সর্বোত্তম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।'*

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অটল প্রয়োগ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের জন্য এবং নব্যস্বাধীন দেশগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বয়ংস্বত্বা ত্বরিত করার জন্য অনুকূল পদবশর্ত সৃষ্টি করে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নশীল দেশগুলিকে

* For Peace, Security, Cooperation and Social Progress in Europe. Berlin, June 29-30, 1976. — Moscow, Novosti Press Agency Publishing House, 1976, pp. 31, 39.

সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশ প্রতিহত করার, অবাধে নিজেদের উন্নয়নপথ নির্বাচনের ও সত্যিকার জাতীয় স্বাধীনতা অনুসরণের সামর্থ্য দেয়। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও অ-বলপ্রয়োগ নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আওতাভুক্ত বিষয় তা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যাবতীয় জের ও নব্য-ঔপনিবেশিক কর্মনীতির যাবতীয় রক্ষকদের অটুট রাখায় সকল চেষ্টা বাতিল করে এবং সেইসঙ্গে মদ্রুতি আন্দোলনে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যদানের বৈধতাকেও স্বীকৃতি দেয়।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংঘাতমুক্ত অবস্থায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনায় সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলির অভিপ্রায় কোনক্রমেই সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিহার বোঝায় না। এই প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের অটলতা ও ধারাবাহিকতাকে স্বস্তিবাদের সঙ্গে, বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের কৃত ক্ষতির নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে ভালগোল পাকানো উচিত নয়। সোভিয়েত নেতারা বারবার তাঁদের ঘোষণায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। জাতিসমূহের মদ্রুতি ও স্বাধীনতার বিনিময়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে না। কোন আক্রমণকারী অসুস্থলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির উপর আঘাত হানতে প্রয়াসী হলে আক্রমণের শিকার হয়ে-ওঠা জাতিটির নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্বগ্রহণের অধিকার থাকে এবং অন্যান্য জাতি সর্ববিধ প্রয়োজনীয় উপায়ে তাকে সাহায্য যোগাতে পারে।

কোন রাষ্ট্রের বৈধ স্বার্থ স্পষ্টতই তার নিরাপত্তার স্বার্থকে

অন্তর্ভুক্ত করে। দাঁতাত প্রক্রিয়ার বিকাশ ও গভীরতা সাধন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দৃঢ়করণ কেবল ওগদুলি সকল রাষ্ট্রের ওইসব স্বার্থের অভিন্ন প্রতিপোষণভিত্তিক হওয়ার নিরিখেই সম্ভবপর। এজন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলির প্রণালীর একটি ভিত্তি হিসাবে অভিন্ন নিরাপত্তা নীতিকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে অটল মতপ্রকাশ করেছে।

অভিন্ন নিরাপত্তার নীতির আধেয় এককভাবে সামরিক বিষয়গুলি বা অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ কিংবা নিরস্ত্রীকরণ ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করে না। এইসব উদ্যোগ এমনভাবে প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন যাতে চুক্তিবদ্ধ কোন শরিকের নিরাপত্তাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির আরও বিস্তৃততর অর্থ রয়েছে। নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার সময় এই নীতির অনুবর্তিতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসমূহকে তাদের পুরোপুরি আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রেও এতদ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এই নীতির ব্যত্যয় কেবল সামরিক দাঁতাতকেই নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁতাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির এই ব্যাখ্যা হল আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক দলিলের এক প্রত্যক্ষ অনুসিদ্ধান্ত, যে-দলিলে তা সূত্রবদ্ধ, গৃহীত এবং দাঁতাত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণে এক অবশ্যপালনীয় আইনে পরিণত করা হয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৯৭২ সালের ২৯ মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক

সম্পর্কের মূল নীতিমালায় শর্ত আছে যে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা ও মজবুত করার পূর্বশর্তগুণি বস্তুত সমতার নীতি পালন ও বলপ্রয়োগের হুমকি প্রত্যাহারের ভিত্তিতে শরিকদের নিরাপত্তা-স্বার্থের স্বীকৃতিতেই নিহিত'। দাঁলে আরও বিবৃত আছে যে অন্য শরিকের মূল্যে একতরফা সুবিধালাভের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা বস্তুত সাময়িক সংঘাত বা পারমাণবিক যুদ্ধ কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টিক্ষম অন্যতর পরিস্থিতিগুণি রোধের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

১৯৭২ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরকালীন যৌথ সোভিয়েত-মার্কিন ঘোষণায় জোর দিয়ে বলা হয় যে, 'সমতার নীতির ভিত্তিতে উভয় দেশের নিরাপত্তা-স্বার্থগুণি বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং তৃতীয় দেশগুণির নিরাপত্তা-স্বার্থের ক্ষতি না ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অশ্রুপ্রতিযোগিতা হ্রাস ও অবসানের জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনায় সক্রিয়ভাবে শরিক হবে।'

১৯৭৯ সালের ১৮ জুন ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত যৌথ সোভিয়েত-মার্কিন ঘোষণা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিকাশের ভিত্তি হিসাবে অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির ব্যাপক তাৎপর্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। এই ঘোষণার শর্তে সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার ভিত্তি হিসাবে এইসব নীতি নির্দেশিত হয়েছিল: সম্পূর্ণ সমতা, অভিন্ন নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান ও অন্যদের ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপের

নীতি এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্কগুলির শান্তিপূর্ণ উন্নয়নে অবদান যোজন, আর এভাবে আন্তর্জাতিক স্থিতি ও বিশ্বশান্তি মজবুত করা। ভিয়েনা ঘোষণার অন্তর্গত আরেকটি ধারা ছিল অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধ উপলক্ষির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দলিল মোতাবেক ‘প্রতিটি শরিকই এই মত প্রকাশ করেছিল যে সে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অভিলাষী নয় এবং ভবিষ্যতেও হবে না, কেননা এতে কেবল মারাত্মক অস্থিরতা দেখা দেবে ও উচ্চতর মাত্রার অস্ত্রসজ্জার উদ্ভব ঘটবে এবং কোন পক্ষের নিরাপত্তায় কোন অবদান যোগাবে না।’

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতার অভিন্ন নিরাপত্তার নীতি প্রয়োগের অপরিহার্যতা ১৯৭৫ সালের ১ আগস্ট স্বাক্ষরিত ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের চূড়ান্ত সংবিধিতে পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। শরিক-দেশগুলি বলেছিল যে তারা চূড়ান্ত সংবিধি গ্রহণ করেছে ‘ইউরোপের নিরাপত্তার অবিভাজ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে’, অর্থাৎ ইউরোপের একাংশের বিনিময়ে অন্যাংশের, একটি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করে আরেকটির, যেকোন রাষ্ট্রের বিনিময়ে অন্য একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টার অগ্রাহ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে। দাঁতাত ও নিরস্ত্রীকরণ উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ইউরোপীয় নিরাপত্তা মজবুত করার আনুষ্ঠানিক মতামতগুলি বিবেচনাক্রমে ইউরোপীয় সম্মেলনের শরিকরা জোর দিয়ে বলেছিল যে এই উদ্যোগের দায়িত্ব নিয়ে তারা পরিচালিত হবে ‘সম্মেলনের

শরিক সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা... যা তাদের সার্বভৌম সমতায় মজ্জাগত।*

অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এইসব দলিলে: জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলর ও বিদেশমন্ত্রীর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর প্রদত্ত যৌথ বিবৃতি, ১৯৭৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত সোভিয়েত-ব্রিটিশ যৌথ বিবৃতি। বিশদভাবে এই নীতিই সুদৃবদ্ধ হয়েছে ১৯৭৯ সালের ২৮ এপ্রিল ঘোষিত উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তির অন্তর্কূলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা কর্মসূচিতে এবং তাতে এর আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'প্রতিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, সমস্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-স্বার্থে, এই চুক্তির শরিক কোন পক্ষেরই স্বার্থ হানি না করার নীতির ভিত্তিতে অস্বশস্ত সীমিত করা ও নিরস্ত্রীকরণের পন্থাবলম্বন করা হোক।'

১৯৭৮ সালে অভিন্ন নিরাপত্তার নীতিটি এমন একটি দলিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক নয়, বরং একটি সর্বজনীন প্রকৃতির -- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। এর ধারানুযায়ী, 'নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এমন ন্যায্য ও সুসম ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত থাকে এবং কোন একক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন পর্যায়েই অন্যদের উপর সুযোগলাভের অধিকার না

* *New Times*, N° 32, 1975.

পায়। অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তির সম্ভাব্য নিম্নতম মাত্রার অক্ষত নিরাপত্তাই হবে প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্য।*

কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির বাস্তব প্রয়োগ বস্তুত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তির অন্তর্হীন বিস্তারের বদলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে একযোগে সামরিক সংঘাতের মাত্রাহ্রাসের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার নিজস্ব নিরাপত্তা এবং মিত্র ও সহযোগীদের নিরাপত্তা রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অভিন্ন নিরাপত্তার এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ-সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ-গুলিতে বিবিধ প্রশালী থাকা সম্ভব এবং তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সহ বিপুল শস্ত্র অস্ত্রশক্তিধর দুটি বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক দলের বিদ্যমানতার বৈশিষ্ট্যটিহিত বর্তমান পরিস্থিতির আওতায় অভিন্ন নিরাপত্তার নীতি পরস্পরবিরোধী সামরিক শক্তিগুলির একটি মোটামুটি ভারসাম্য, স্থিতি বা সমতায় নিজের বাস্তব অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে।

এই মূলসূত্রেই ইউরোপ ও সারা দুনিয়ায় নিরাপত্তা রক্ষার অভিমুখী সোভিয়েত বৈদেশিক কর্মনীতির ভিত্তিটি নিহিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, ওয়ারশ চুক্তিসংস্থা ও ন্যাটোর মধ্যে বিদ্যমান সামরিক ও স্ট্রাটégিক ভারসাম্য বিষয়গতভাবে বিশ্বশান্তি অটুট রাখে। প্রতিপক্ষের উপর আমরা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব চাই নি, এখনো

* Final Document of Assembly Session on Disarmament, 23 May—1 July, 1978. United Nations. Office of Public Information, p. 8.

চাইছি না। আমাদের নীতি তা নয়। কিন্তু আমাদের উপর এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনও আমরা মেনে নেব না। এই ধরনের প্রচেষ্টা ও শক্তির অবস্থান থেকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা হল একেবারেই নিষ্ফল।*

সামরিক ভারসাম্য অটুট রাখার কথা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নেতারাও স্বীকার করেছেন। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় মধ্যে স্ট্রাটégিক অস্বশস্ত ও অপারমাণবিক শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্নিহিত বজায় আছে,' — ১৯৭৮ সালের জুনে ঘোষণা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট কার্টার। 'আমরা মনে করি ভারসাম্য বজায় আছে আর তাই ভয়েরও কোন কারণ নেই,' — ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে টেলিভিশনে ঘোষণা করেন ইংলণ্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী কালাহান। সেই একই অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে ফেডারেল জার্মানির চ্যান্সেলর শ্মিড্ট কালাহানের সঙ্গে একমত হয়ে আরও যোগ করেন: 'এই ভারসাম্য ভঙ্গের ব্যাপারে আমি কোন বিপদ দেখছি না।' জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লেবের ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে মতপ্রকাশ করেন যে ন্যাটোর সশস্ত্র বাহিনীর মোট শক্তি ওয়ারশ চুক্তিসংস্থাভুক্ত দেশগুলির অনুরূপ শক্তির সমান। আর ইউরোপে ন্যাটো সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্কিন জেনারেল হেগ ১৯৭৮ সালের জুনে 'ইউ. এস. নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে মধ্য-ইউরোপে শক্তির অনুপাত

* Documents and Resolutions. The 26th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. . . , p. 30.

সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, 'যথার্থ অর্থেই আমাদের শক্তি সমান সমান।'*

সামরিক ও স্ট্রাটেজিক ভারসাম্য অর্জন ও অব্যাহত রাখা বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির একটি প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্ত হলেও তা কোনক্রমেই রাষ্ট্রগুলির অস্বসজ্জার বর্তমান স্তরে এই ভারসাম্য স্থির রাখা বা উচ্চতর স্তরে তা অব্যাহত রাখা বোঝায় না।

অভিন্ন নিরাপত্তার নীতি ও সামরিক সমতা অব্যাহত রাখা কোনভাবেই তথাকথিত আতঙ্কের ভারসাম্য বা পরস্পরকে ভয়প্রদর্শনের মাধ্যমে নিবৃত্ত করার ভুলের ন্যায়তা প্রতিপন্ন করে না, যে-তত্ত্ব সংঘর্ষের সামর্থ্য উন্নয়নের ওজুহাতে প্রতিবারই আরও ভয়ঙ্কর, আরও ধ্বংসাত্মক নতুন অস্ত্রশস্ত্র স্তুপীকৃত করার পথ দেখায়। অভিন্ন বা অক্ষত নিরাপত্তার নীতি অবশ্যই বিপরীত ফল ফলাবে, অর্থাৎ সশস্ত্রবাহিনী ও অস্ত্রসজ্জার পরিমাণ হ্রাস করবে।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলি যখনই পরস্পরের ন্যায় স্বার্থগুলি বিবেচনায় এবং রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির অটল অনুবর্তিতার ভিত্তিতে নিজের সম্পর্ক উন্নয়নে বাস্তব আগ্রহ দেখায় তখনই রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ ঘটে। ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বিষয়ক সম্মেলনের চূড়ান্ত সংবিধিটি শরিক সব-গুলি দেশের স্বার্থসমূহের একটি সুক্কন্ম ভারসাম্য প্রতিফলিত করে এবং তা হল সাধারণ রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক দলিলগুলির একটি নজির। এতে

* U. S. News and World Report, June 5, 1978, p. 20.

মহাদেশের শান্তিপূর্ণ বিকাশের মূলনীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত ও সকল শরিকের অভিন্ন ইচ্ছাশক্তিতে মোহরবদ্ধ।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাপ্রধান দেশগুলির সাধারণ রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি হল একাধারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি ফলশ্রুতি এবং একইসঙ্গে তার অব্যাহত অস্তিত্ব, বিকাশ ও গভীরতার একটি নিশ্চয়তা। এই ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ ঘটান মোটেই সহজসরল ব্যাপার নয়। এটি অর্জনের বাধা হয়ে আছে সর্বাধিক আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির স্বেচ্ছাদত্ত প্রতিরোধ এবং অন্যদের পক্ষপাত, সন্দেহ ও সত্যিকার অবস্থান ও সম্ভাবনার সঙ্গে অপরিচয়, এমন কি জানার অনিচ্ছা।

স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য, বিরোধীদের ভৌত শক্তির প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া আরও প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি নতুন মনস্তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক পার্টি ও সামাজিক সংগঠনগুলির সম্পর্কনিয়ন্ত্রণ একটি নতুন মেজাজে উত্তরণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি নতুন প্রণালী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে সার্বভৌমত্বের, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-হস্তক্ষেপের নীতিগুলি সংভাবে ও অটলভাবে পালনের মাধ্যমে, দৃঢ়মুখো আচরণ ও অনিশ্চিত কৌশল বর্জনক্রমে, দ্বাঞ্জনিত সন্ধি ও চুক্তিগুলি অবিরাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

হয়। নিরস্ত্রীকরণ — সমাজতন্ত্রের আদর্শ

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগেই লেনিন লিখেছিলেন: 'নিরস্ত্রীকরণ — সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যুদ্ধ থাকবে না, ফলত নিরস্ত্রীকরণ অর্জিত হবে।'*

রাশিয়ায় বিপ্লবের জয়লাভ, প্রথম ও তৎকালের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মণ্ডে তার প্রবেশ নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রামের জন্য বাস্তব ভিত্তি তৈরি করেছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুরো ইতিহাসে নিরস্ত্রীকরণ অনুসরণ তার বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থেকেছে। নিরস্ত্রীকরণের মূলনীতিগুলি সর্বোচ্চ বিধানিক দলিলগুলিতে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম ডিক্রি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান পর্যন্তও প্রতিষ্ঠিত, সংস্থাপিত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পুরো বহুমুখী আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থামানোর, অস্ত্রসজ্জা সীমিত ও হ্রাস করার তথা নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রামের গুরুত্ব সমধিক। এটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যশীল কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত।

* Lenin, V. I. *Collected Works*, Vol. 23, p. 95.

বৈদেশিক রাজনৈতিক প্রতিনিয়ার পথ ও প্রকৃতি, এমন কি তার গতিবেগও দুটি পরস্পর বিজড়িত ও সরাসর বিপরীত প্রবণতা দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। একদিকে, তা রাজনৈতিক বলয়ে উত্তেজনা হ্রাসের একটি অগ্রগতি, যদিও তা খুব দ্রুত ও প্রত্যক্ষ নয়। অন্যদিকে, অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অব্যাহতগতি, উন্নতি ও ঘনীভবন দ্বারা পরিবেষ্টিত সামরিক দাঁতাতের ক্ষেত্রে বিরাজিত বন্ধাবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ চক্রগর্দল সামরিক প্রযুক্তির দ্বারাই সামাজিক লড়াইয়ে তাদের ক্ষতির, ঔপনিবেশিক দখলগর্দল হারানোর ক্ষতির এবং পর্দাজিত্ন থেকে সর্বকালের বর্ধমান সংখ্যক দেশের প্রস্থানের, বিশ্বসমাজতন্ত্রের সাফল্য ও বৃজ্জোয়া রাষ্ট্রসমূহে কমিউনিস্ট পার্টিগর্দলির বর্ধমান প্রভাবের প্রতি তাদের প্রক্রিয়া ব্যক্ত করে। শক্তির অবস্থান থেকে সাম্রাজ্যবাদ তার আশপাশের অন্যান্য দেশ ও জাতিগর্দলিকে হুকুম দেয়ার ক্রমক্ষীয়মাণ সামর্থ্যটুকু আঁকড়ে রয়েছে। এই হল বর্ধমান অস্ত্রপ্রতিযোগিতার পশ্চাদবর্তী হেতু। ন্যাটোর দেশগর্দলি, মধ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে নতুন মাত্রা ও নতুন গুণ সংযোজনে প্রয়াসী।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ও উৎসাহীদের মত হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ সমাধানের মূল পন্থা — শক্তির আশ্রয় গ্রহণ। নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি করে ন্যাটোর অন্যান্য দেশকে নিজের দলে টানছে। জাপানী সমরবাদের পুনর্জন্মের এবং তাকে এই জোটের সামরিক যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে।

সামরিক-প্রযুক্তিগত বিকাশ বর্তমানে এক সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এমনসব নতুন অস্ত্রপ্রণালী বিকশিত হচ্ছে অথবা উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যেগর্দলির

পরিমাণগত ও গুণগত দিক পরস্পরের পক্ষে মোটেই
 যাচাইসাধ্য হবে না। আরও নতুন নতুন ধরনের স্ট্রাটোজিক
 অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। আর পরবর্তী পর্যায়ে এমনসব
 তৈরি হবে যা দেখে স্ট্রাটোজিক সন্স্থিতির সম্পর্কে এবং
 পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সাফল্যজনক সীমিতকরণ ও
 হ্রাসকরণের খোদ সম্ভাবনা সম্পর্কিত ধারণারই আমূল
 পরিবর্তন ঘটবে।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বর্তমান বৈশ্বিক প্রকৃতির জন্যও
 নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি হয়ে উঠেছে।
 পরিমাণের দিক থেকে তা রীতিমত আতঙ্কজনক।
 জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রদত্ত তথ্যানুসারে বিদ্যমান
 পারমাণবিক মজুদদের পরিমাণ হিরসিমা ধ্বংসকারী বোমার
 ১৩ লক্ষাধিকটির সমতুল্য। ইউরোপে মোতায়েনকুত
 ট্যাকটিকাল পারমাণবিক অস্ত্রগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছ'বছরে
 ব্যবহৃত মোট বিস্ফোরকের বহু দশগুণেরও বেশি শক্তিশালী।
 বিশ্বজনসংখ্যার মাত্রাপিছদ এখন আছে ১৫ টন ওজনের
 সাবেকী বিস্ফোরকের সমতুল্য একটি মারাত্মক বোমা।

সামরিক অর্থনীতি বিপুল পরিমাণ শ্রম সহ প্রাকৃতিক,
 শিল্পগত ও আর্থিক সম্পদ গ্রাস করেছে। জাতিসংঘের
 মহাসচিবের একটি প্রতিবেদন অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
 পর থেকে অদ্যাবধি অস্ত্রপ্রতিযোগিতার খরচা দাঁড়িয়েছে
 জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবকল্প একটি সংখ্যা — ৬ লক্ষ-কোটি
 ডলারের বেশি। পৃথিবীর সবগুলি দেশের মোট বার্ষিক
 সামরিক খরচা ৫০ হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি এবং তা
 নিরন্তর বাড়ছে।

গত দশকে ন্যাটো-ভুক্ত দেশগুলির সামরিক খরচার মোট

পরিমাণ ছিল ১.৩ লক্ষ-কোটি ডলার। প্রায় ৪ লক্ষ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকৌশলী সহ সামরিক ক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

স্বাভীমান সামরিক বাজেট মদ্রাস্থীতি বাড়ায় এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কোটি কোটি মেহনতির উপর দর্ভার বোঝা হয়ে ওঠে। সমতুল্য বেসামরিক শিল্পগুলির তুলনায় সামরিক উৎপাদনের লগ্নিতে ষথেষ্ট পরিমাণে কম চাকুরি সৃষ্টি হয়। এভাবে অসুপ্রতিযোগিতা বেকারী সমস্যাতে তীব্রতর করে তোলে। এতে সমাজের সামরিকীকরণ ত্বরিত হয় এবং দক্ষিণপন্থী, চরম-দক্ষিণপন্থী আন্দোলন ও শক্তিসমূহ, নব্য-ফাশিস্ট ও সন্ত্রাসবাদী দলগুলি গড়ে ওঠার অন্তকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়।

শক্তিসংস্থান সমস্যার মৌলিক সমাধান সন্ধানের জন্য, বহুব্যাপ্ত রোগ, বদভুক্ষা, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা উৎখাতের জন্য এবং প্রতিবেশের মারাত্মক পরিবর্তন রোধের জন্য প্রয়োজন বিপুল সম্পদ, যা অব্যাহত অসুপ্রতিযোগিতা ক্রমাগত গ্রাস করেই চলেছে।

সকল শোষণমূলক ব্যবস্থাদীন রাষ্ট্রসমূহ প্রায়শই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি দ্বারা সমর্থিত সশস্ত্র শক্তিকে তার নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার প্রধান, কখনো-বা একমাত্র উপায় মনে করত। রীতিটি এখনো প্রচলিত এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে, পশ্চিম দুনিয়ার নিরাপত্তার রক্ষার ওজুহাতে সাম্রাজ্যবাদতড়িত অসুপ্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। এরই ফলশ্রুতিই তো ন্যাটো জোট মজবুত করার উদ্যোগ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের উত্থাপিত — একসঙ্গে ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তিসংস্থা দুটি ভেঙ্গে দেয়ার বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছনোর

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাদের সামরিক সংগঠনগুলি ভেঙ্গে দেয়ার — প্রস্তাবগুলির অটল প্রত্যাখ্যান। নতুন সদস্য গ্রহণের মাধ্যমে ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তিসংস্থা দুটির আয়তন বৃদ্ধি না করার সোভিয়েত প্রস্তাবটিও পশ্চিমা শক্তিবর্গ প্রত্যাখ্যান করেছিল। অস্ত্রবলের মাধ্যমে নিরাপত্তার সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি, যা কার্যত অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অব্যাহত অস্তিত্ব ও বিস্তারের নামান্তর, তা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অস্ত্রসম্ভার ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা থামানোর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জনের কর্মনীতিকে প্রতিস্থাপিত করে। ‘এমন একটিও সমস্যা নেই, যা আমাদের দেশ সামরিকভাবে সমাধান করতে চায়,’ বলেছিলেন আন্দ্রেই গ্রমিকো। ‘অস্ত্রপ্রতিযোগিতা প্রশমন ও নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলিতে আমরা আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি উভয়টিই দেখি, যেসব চুক্তি হবে ন্যায্য ও তাতে অভিন্নভাবে বিবেচিত হবে সংশ্লিষ্ট সকল শরিকের স্বার্থ।’*

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থামান ও হ্রাস, তদুপরি নিরস্ত্রীকরণ, নিজের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সকল দেশের নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য এই হাতিয়ার বিবেচনা সহ নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গিটি যে-মূলসূত্রে নিহিত তা হল: এক্ষেত্রে যেকোন সূর্যনির্দিষ্ট ব্যবস্থাবলীর সম্প্রসারণ সর্বদিক থেকে সর্বকালে সমতা ও অভিন্ন নিরাপত্তা নীতির অনুসারী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের

* *Moscow News*, Supplement to Issue. N° 22, 1978, p. 10.

বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে দেখায় যে তারা কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করছে, তারা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে না এবং তারা সামরিক শক্তির মাত্রা কমানোর জন্য সচেষ্ট।

কিন্তু পশ্চিমে তথাকথিত 'সোভিয়েত সামরিক হুমকির' লাগামহীন প্রচার এখন বিস্তৃত হচ্ছে। 'অস্ত্রনির্মাতা ও মিথ্যা-নির্মাতাদের মধ্যে এক অশুভ মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে,' বলেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মী বরিস পনোমারেভ। 'মিথ্যা-নির্মাতাদের উৎপাদ, তাদের অস্ত্রটি ইতিমধ্যেই কাজ করছে। তার গর্দলিবর্ষণের অন্যতম লক্ষ্য হল দাঁতাত। পশ্চিমের মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি এই উপকথা শেখান হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মতুষ্টি, হয়ত উন-অস্ত্রসজ্জিত ও নিরুদ্ভিন্ন বিশ্বের বাকী অংশকে পরে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নাকি সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা করছে। হাজার ধরনের ভাষ্য দিনের পর দিন এই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি হল পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নতুন অস্ত্রকর্মসূচি চালান করার মূল উপায়।'

তথাকথিত 'সোভিয়েত সামরিক হুমকি' বা সামরিক ক্ষেত্রে 'পশ্চিম পেছনে পড়ে আছে' এই ধরনের সোচ্চার প্রচার সহ পশ্চিমই যে সর্বদা অস্ত্রপ্রতিযোগিতার নতুন পেঁচ সৃষ্টির প্ররোচনা যোগায়, ইতিহাসই সেই সাক্ষ্য দেয়।

১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করেছিল। এই ভয়ঙ্কর নতুন অস্ত্রটি বর্জনের জন্য সোভিয়েতের প্রস্তাব পশ্চিমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। খুব বেশি দিন হয় নি সোভিয়েত ইউনিয়নও একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার मित्रদের বিরুদ্ধে ব্যাহমুখ হিসাবে ন্যাটো চুক্তিসংস্থা গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। ছ'বছরের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকের পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার অভিযোগ্য 'বোমারু বিমানের ফারাক' বিষয়ে একটি প্রচার চালান হয়। অচিরেই এই প্রচারের ভিত্তিহীনতার স্বীকৃতি মেলে। অবশ্য ইতিমধ্যেই স্ট্রাটাজিক বি-৫২ বোমারু বিমানের একটি বহর নির্মিত হয়ে গিয়েছিল।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শত্রু হয় অনুরূপ 'ক্লেপনাস্ট্র ফারাক' সম্পর্কে প্রচারণা। কিছু দিনের মধ্যেই যথাপূর্বং সরকারীভাবে এর ভিত্তিহীনতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই শত্রু হয়ে গিয়েছিল অসুপ্রতিযোগিতার একটি নতুন অগ্রমুখী উচ্ছ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করেছিল সহস্রাধিক আন্তর্জাতিক স্ট্রাটাজিক ক্লেপনাস্ট্র ও ক্লেপনাস্ট্রবাহী একটি পুরো সাবমেরিন বহর।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটন তার ক্লেপনাস্ট্রগুলিতে বহুবিধ স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যভেদক্ষম পুনঃপ্রবেশ যান বসানোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পারমাণবিক রণমুখের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল।

আশির দশকে আরেকবার 'সোভিয়েত হুমকি' প্রচারের ডামাডোলের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের তুলনায় ন্যাটো

জোটের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নগ্ন ধারা অনুসরণ করা হয়।

শান্তির দিনে মার্কিন প্রশাসনযন্ত্র বাৎসরিক সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। ১৯৮৫-১৯৮৯ সালের কালপর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে সামরিক বরাদ্দের পরিমাণ হবে ২ ট্রিলিয়ন ডলার — ঠিক যত ডলার পেণ্টাগন খরচা করেছিল যুদ্ধ পরবর্তী ৩৫ বছরে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয়েছে 'আশির দশকের জন্য এক সার্বিক স্ট্রাটেজিক কর্মসূচি,' যা অনুসারে সর্বাগ্রে জোরদার করা হবে নতুন ধরনের স্ট্রাটেজিক আক্রমণাত্মক শক্তি : আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক রকেট 'এম এক্স', 'মিজটম্যান', 'ট্রাইডেন্ট' রকেটে সজ্জিত পরমাণুচালিত ডুবোজাহাজ, স্ট্রাটেজিক বোমারু-বিমান 'বি-১বি' ও 'স্টেল্ট', বহুদুর্ধ্বী মহাকাশ-ব্যবস্থা 'শাটল', জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ভিত্তিক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণা থেকে জানতে পারি যে স্থলবাহিনীকে নতুন প্রযুক্তিতে সজ্জিত করার জন্য ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া চলছে। যেমন আমেরিকা মহাদেশে, তেমনই ন্যাটোর অন্যান্য দেশের রাজ্যসীমায় রিজার্ভ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছে।

পদনঃস্প্রসঙ্গার এই সার্বিক কর্মসূচির লক্ষ্য — সামরিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। মার্কিন সমরবাদীদের স্বপ্ন অনুযায়ী কেবল তখনই একটি সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রকে উৎখাতের কাজে নামা, জাতিসমূহের মর্দুতি আন্দোলনের মোকাবিলা করা এবং

বিশ্বে নিজ প্রভুত্ব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থানুকূল ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

শান্তির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী কর্মনীতি যে ভয়ঙ্কর তা বৃদ্ধিতে পেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্ভাব্য সব রকমের পন্থাবলম্বন করছে, যাতে সামরিক হুমকি আরও না বাড়ে, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায় এবং সর্বাপ্রকার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সহ অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে যথার্থ অর্থই সংখ্যাভাস সম্ভবপর হয়।

পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের অতি যুক্তিসঙ্গত হ্রাসকরণের জন্য ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলি মতপ্রকাশ করে চলেছে। তারা প্রস্তাব রেখেছে পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ ও গ্রন্থ তার ভাঙারের বিলোপসাধন করা হোক, তদনুসারে পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হোক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজেদের প্রস্তাবগুলি প্রথমত ও প্রধানত সকল রাষ্ট্র ও জাতির বৈধ অধিকার ও স্বার্থগুলি বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য একটি স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থ প্রতিফলিত করে। এই অর্থে ওই সবগুলি প্রস্তাবই বাস্তবধর্মী ও কার্যকর। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছু কিছু সরকার নিজস্ব কারণেই প্রস্তাবগুলি উত্থাপনের সময় সেগুলি পুরোপুরি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। এই ধরনের জটিল বিষয়ে সমঝোতা পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন একটি চুক্তির শর্তাবলী ও নিহিতার্থের অনুপদ্ধতি পরীক্ষা, আলাপ-আলোচনার সময় নির্দিষ্ট মীমাংসায় পৌঁছন।

কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত না হলে

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য কালক্ষেপই করবে, যা আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে দেখা গেছে। বস্তুত, আজ কার্যকর ও আংশিকভাবে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা সীমিত করেছে এমন প্রায় সবগুণী আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ব্যাপকতর ও দীর্ঘতর-মেয়াদি প্রস্তাবেরই বাস্তব ফলশ্রুতি। নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবগুলি যে কোন স্বপ্নবস্তু নয়, এ হল তারই আরেকটি প্রমাণ। এগুলি নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বাস্তব অগ্রগতিকে ত্বরিত করে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের একাধারে বাস্তব ও দীর্ঘমেয়াদি এই দৃষ্টিভঙ্গি অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থামানোর সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাসম্বলিত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিকে সর্বব্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। সোভিয়েত অবস্থানের সারকথা অতি স্পষ্ট: সোভিয়েত ইউনিয়নের মতে মানবজাতিকে মৃত্যুর অভিমুখে নিয়ে যাওয়া চলে না। অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অবসান ঘটান উচিত ও তা সম্ভব। ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের ভারে হাঁফ-ছাড়া ও সংঘর্ষপূর্ণ দুনিয়ায় বাস করার চেয়ে মানবজাতির পুরো অধিকার আছে উত্তম দুনিয়ায় বসবাসের।

নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে সার্বিক ও সর্বাঙ্গিক নিরস্ত্রীকরণ। কিন্তু বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংযমী মূল্যায়ন থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আশা সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের একটি চুক্তিসম্পাদনের ধারণাকে আজ অবাস্তব মনে করে। সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের জন্য প্রয়োজন অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থামান, অস্ত্রসজ্জাহাস ও নিরস্ত্রীকরণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সহ প্রস্তুতির অপেক্ষাকৃত একটি দীর্ঘ কালপর্ব।

বর্তমানের বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্বপ্রতিযোগিতা বন্ধের শর্তেই সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ কেবল শূন্য হতে পারে। এই লক্ষ্যার্জনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়ে আসছে, যেগুলির বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণাতীত ও অনন্যমুখী পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের অস্ত্র-উৎপাদন বন্ধ করার শৃংখলার দিকে অস্বপ্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পারত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব রাখছে যে পরিমাণ ও গুণের বিচারে সমস্ত রকমের পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডারের সর্বকিছু উপাদানের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করা হোক, নতুন ধরন ও রকমের পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ, নতুন নতুন ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রপ্রেরণ সহ পারমাণবিক অস্ত্রের সব রকমের পরীক্ষার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (মরটরি) জারি করা হোক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতে যেমন মাঝারি পাল্লার, তেমনই কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের হাত থেকে ইউরোপ মহাদেশকে মুক্ত করা দরকার। সে এর পক্ষে যেন ইউরোপে মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার একবারে তিনগুণ পর্যন্ত কমান হোক এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের নতুন কোন অস্ত্র এখানে নির্মিত না হোক। মহাকাশে সামরিক অস্ত্রের পরিসর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত প্রত্যয় অনুযায়ী নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাবলী বাস্তবায়নের উপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ একান্তই বাঞ্ছনীয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের, তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিভঙ্গের, তার বিরুদ্ধে শক্তির অবস্থান থেকে কর্মনীতির বাস্তব প্রয়োগের

তিক্ত অভিজ্ঞতা — এর সবগুলিই নাটকীয়, কখনো-বা নিষ্ঠুর শিক্ষা হিসাবে সোভিয়েত জনগণকে দেখিয়েছে যে তার নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত চুক্তিগুলির সঙ্গে অবশ্যই থাকা চাই সংশ্লিষ্ট শরিকদের দ্বারা ওগুলি বাস্তবায়নের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ।

নিয়ন্ত্রণ সমস্যার ব্যাপারে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির দুটি মৌলিক দিক এখানে উল্লেখ্য। প্রথমত, নিয়ন্ত্রণকে বোঝা হয়েছে অস্বসজ্জা সীমিত ও হাস করণ চুক্তির বাস্তবায়নের নিয়ন্ত্রণ হিসাবে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে অসম্পর্কিত একটি পৃথক ব্যবস্থা হিসাবে নয়। অর্থাৎ, নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ, অস্বসজ্জা নিয়ন্ত্রণ নয়। দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি যখন নিয়ন্ত্রণে আহত, তখন তা হবে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাবলীর পরিমাণ, প্রকৃতি ও নির্দিষ্ট চারিত্র্যের সঙ্গে অবশ্যই মানানসই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিরস্ত্র অন্তর্দৃষ্টিভঙ্গি হল অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থের অন্তর্দৃষ্টিভঙ্গি। সুনির্দিষ্ট ও সত্যিকার নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাবলীতে এই যৌথভাবে গৃহীত পদক্ষেপের রূপান্তর সাধনই এখন প্রধান সমস্যা, যাতে বিজড়িত অটল ও কঠোর সংগ্রাম।

ন্যাটো পরিষদে গৃহীত ইউরোপে নতুন মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর সিদ্ধান্ত হল শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ লক্ষ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটি বাস্তবায়নের অর্থ হল পশ্চিমের পারমাণবিক সামর্থ্য বৃদ্ধির চেয়ে অধিকতর কিছু। ব্যবস্থাটি বস্তুত অস্বপ্রতিযোগিতার গৃহগত নতুন একটি পেঁচ শুরুর প্রচেষ্টা, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে পৃথিবীতে বিদ্যমান সামরিক ও স্ট্রাটégিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। ন্যাটোর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যত বিশ্বশান্তির প্রতি দুর্নিয়্যাব্যাপ্ত এক

হুমকির সামিল। ইউরোপে বিদ্যমান স্বীকৃত শান্তিাঙ্ঘাত বদলে দিয়ে এই পরিকল্পনাগুলি ইউরোপ মহাদেশকে দুর্নিয়াজোড়া পারমাণবিক আগুন জ্বালানোর সম্ভাব্য বিস্ফোরকের ভূমিকাসীন করছে এবং ইউরোপের মানুষকে তার প্রথম শিকারের ভূমিকাটি দিয়েছে। এইসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্র বসানোর অকুশ্লল হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকেই মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত করবে এবং তাদের প্রতিবেশী আর মিত্ররাও অভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হবে।

পশ্চিম ইউরোপে আধুনিকীকৃত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্র বসানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অস্প্রপ্রতিযোগিতায়, বিশেষত পারমাণবিক অস্প্রশস্ত বৃদ্ধিতে যথাসম্ভব ইন্ধন যোগাবে, কেননা পশ্চিম ও ন্যাটোর এই শ্রেষ্ঠত্ব 'বৈধকরণ' রোধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রবর্গ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

নিজ দেশের নিরাপত্তা, নিজ মিত্র ও শরিকদের নিরাপত্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন যেকোন অবস্থাতেই রক্ষা করতে প্রস্তুত। বিদ্যমান সামরিক-স্ট্রাটোজিক ভারসাম্য বিনষ্টের যেকোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যথাযথ উত্তর দিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্ষম।

তবে ব্যাপক ধ্বংসক্ষম অস্প্রশস্তের উৎপাদন ও মজুত করার প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন নীতিগতভাবে বিরোধী। এপথে মানবজাতির সম্মুখস্থ কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্যাগুলি হল: রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানুষের সাধারণ জীবনযাপনের অনাকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি, তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা।

অস্বপ্রতিযোগিতার পিছনে অনর্থক ঢালা বৈষয়িক সম্পত্তি বাঁচান, মানুষের অসীম সৃজনী সম্ভাবনার উদঘাটন — একমাত্র এর কল্যাণেই মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে একমাত্র এই হওয়া উচিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কর্মনীতি নির্ধারণের চাবিকাঠি।

* * *

সাম্প্রতিক বছরগুলি বিশ্বরাজনীতির দুটি প্রবণতার সংগ্রাম দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছে। একদিকে চলেছে অস্বপ্রতিযোগিতা হ্রাসের, শান্তি ও দাঁতাত মজবুতের, জাতিসমূহের সার্বভৌম অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা। অন্যদিকে রয়েছে দাঁতাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, অস্বপ্রতিযোগিতা বাড়ানোর, মুক্তিসংগ্রাম দমনের এবং হুমকি ও অন্যদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কর্মনীতি অনুসরণের অবিরাম প্রয়াস। সাম্রাজ্যবাদের, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মনীতি দ্রুতগতিতে অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে জেনেভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গরবাচভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের মধ্যে সাক্ষাৎকারটি আন্তর্জাতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এই আলাপ-আলোচনার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃদ্বয় এক যুক্ত দলিলে ঘোষণা করেন: পারমাণবিক যুদ্ধ কখনই বাধা উচিত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেকোনো

ধরনের পারমাণবিক বা সাধারণ যুদ্ধ প্রতিহত করার তাৎপর্যের কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে তাঁরা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করবেন না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

সেইসঙ্গে মার্কিন শাসকদের 'তারকা যুদ্ধের' পরিকল্পনা বর্জনের অনিচ্ছার ফলে জেনেভায় সত্যিকার নিরস্ত্রীকরণ, বিশেষত, পারমাণবিক ও মহাকাশ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট চুক্তিতে পৌঁছন সম্ভবপর হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জরুরি সমস্যাদি সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও কার্যকলাপের সঠিকতা বথার্থই সপ্রমাণ করেছে: যুদ্ধের হুমকি হ্রাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শৃঙ্খল ও আমূল দিকবদল সূচনা।

18 May 1998*

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশকালয় বাধিত হবে।
অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union



৪৩৫ ৫১

বইটি 'প্রাক্তনৈতিক সাহিত্যমালা' — বর্তমান কালের সমাজবিকাশের বিবিধ সমস্যা বিষয়ক গ্রন্থমহরীর অন্তর্গত। সমাজের গঠন, তার ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং আধুনিক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির জনবোধ্য বিশ্লেষণই বইগুলির বিষয়বস্তু।

লেখকরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রায়োগিক দিক এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত বিকাশের বৈশিষ্ট্য আর শান্তির জন্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বইগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত্তি ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রয়োগ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য লিখিত।